কাব্যসাহিত্যে
মাইকেল মধুসূদন

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ
প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, বিচিত্রা, ভারতবর্ষ, বঙ্গশ্রী,
দেশ প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার
লেখক এবং বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

এ. মুখার্জ্জি অ্যাণ্ড কোং : কলিকাতা
১৯৩০

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২, কলেজ স্কোয়ার ; কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মুদ্রাকর
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ
৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন ; কলিকাতা

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় পিতৃদেব

বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক

স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

আমার এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিপ্রতিভা ছিল নব নব উন্মেষশালিনী। তিনিই বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক যুগের উন্মেষ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্য তাঁহার নিকট চিরঋণী। কিন্তু তাঁহার কাব্যের কোনও সুসংবদ্ধ আলোচনার সহিত বাংলার পাঠকসমাজ পরিচিত নহেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী" নামক গ্রন্থে মধুসূদনের জীবনী আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার কাব্য নাটকাদির আলোচনা করিয়াছিলেন। কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনী-গ্রন্থ 'মধুস্মৃতি'র মধ্যেও স্থানে স্থানে মধুকবির কাব্য নাটকাদির আলোচনা করিয়াছিলেন। কবিবর শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় মধুসূদনের কাব্যনাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য।

সুতরাং কাব্যসাহিত্য-সৃষ্টিতে মাইকেল মধুসূদনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিবার উদ্দেশে আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে, কাব্যসাহিত্যের পুষ্টি ও পরিণতিসাধনে মাইকেল মধুসূদনের স্থান কোথায়, তাহা এই পুস্তকে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা ভিন্ন, এই গ্রন্থে মধুসূদনের প্রত্যেকখানি কাব্যের বিশদ পৃথক আলোচনাও আছে; মধুসূদন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের বিশিষ্টতা ও পরিণতিলাভের আলোচনা আছে; তাঁহার কাব্যসমূহে পাশ্চাত্য কবিগণের কল্পনাভঙ্গির ও পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের প্রভাবের কথা বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে মধুসূদনের সাহিত্য কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ ও এম. এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত। সুতরাং গ্রন্থখানি রচনা করিতে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদিগের প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়াও অনেক প্রশ্নের

মীমাংসা করিয়াছি। ইহাকে মধুসূদনের কাব্যানুরাগী পাঠকবর্গের পাঠোপযোগী করিতেও চেষ্টা করিয়াছি। আমার এই অকিঞ্চিৎকর আলোচনায় যদি ছাত্রছাত্রীগণ এবং ভাবুক ও সাহিত্যরসিক পাঠকগণ তৃপ্তিলাভ করেন তবে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি যে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী পথিকৃৎদিগের অনুসরণ করিয়াছি একথা অকপটে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী', নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি', শশাঙ্কমোহন সেনের 'মধুসূদন', জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সম্পাদিত 'মেঘনাদবধ কাব্য', দীননাথ সান্যাল মহাশয়ের সম্পাদিত মধুসূদনের কাব্য প্রভৃতি অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি হইতে এই গ্রন্থ রচনার অনেক উপকরণই সংগৃীত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, মধুসূদনের পত্রাবলী হইতেও এই গ্রন্থ রচনার বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি ইহাদের সকলের প্রতি আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সংস্করণে 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামক পরিচ্ছেদটি পুনর্লিখিত করিয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ঐ পরিচ্ছেদে মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়াছি এবং মেঘনাদবধ কাব্যান্তর্গত চরিত্রসমূহের ও বিষয়বস্তুর বিশদ আলোচনা করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন এই সংস্করণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে, মহাকাব্য হিসাবে মেঘনাদবধকাব্য সম্বন্ধে এবং মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে তিনটি নূতন পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইয়াছে। বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রত্যেকটি নায়িকার চরিত্রের বিশদ আলোচনাও এবারকার এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল। সুতরাং আশা করি যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণ অপেক্ষা বর্ত্তমান সংস্করণখানির উপাদেয়তা মধুসূদনের কাব্যানুরাগী পাঠকবর্গ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন

কবিত্ব উন্মেষ

বাংলা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ, ইংরেজী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ জানুয়ারী মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদীতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ি গ্রাম কবির জন্মভূমি। সাগরদাঁড়ি গ্রামখানি প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। তরুরাজির শ্যামলিমায়, নদীর কলতানে, পক্ষীর কূজনে, পত্র-পুষ্পের বর্ণ-বৈচিত্র্যে গ্রামখানি মনোরম। সাগরদাঁড়ির তিনদিক বেষ্টন করিয়া কপোতাক্ষ নদীটি প্রবাহিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৰ্দ্ধিত করিয়াছে। কবি মধুসূদন তাঁহার বাল্যকাল এই মনোরম গ্রামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বালক-বয়সে তিনি কপোতাক্ষ নদীতীরে সময় যাপন করিতে ভালবাসিতেন এবং কপোতাক্ষের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। এই কপোতাক্ষ তীরবর্ত্তী বিশ্বপ্রকৃতির মাধুর্য্যই বালক মধুসূদনের চিত্তকে ভাবপ্রবণ করিয়া তুলিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি উৎসারিত করিয়াছিল।

কবি-মানসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন —"আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির নানাদিক থেকে প্রেরণা আসে—বিশ্বপ্রকৃতির রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্পর্শ নিরন্তর আমাদের মনের মধ্যে দূত পাঠাচ্ছে। প্রভাতের আলো, আকাশের নীলিমা, পাখীর কলরব, সমুদ্রের তরঙ্গ আমাদের মনে বিচিত্র বাণী বহন করে আনছে। আমরা হয়তো অনেক সময়ে অন্যমনস্ক থাকি, কিন্তু নিরন্তর তার অভিঘাত চলেছে, আমাদের মনকে জাগিয়ে রেখেছে।" (রবীন্দ্রনাথ, মানসী কাব্যের ব্যাখ্যা—দেশ ৪১-শ সংখ্যা।) কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থও বলিয়াছেন—Nature is both law and impulse। মধুকবির

বেলাতেও প্রকৃতির প্রভাব ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। প্রকৃতির প্রভাবে তাঁহার মন কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল বাল্যকালেই। মধুসূদনের বালক-বয়সেই প্রকৃতি-পরিচয় এত গভীর হইয়াছিল যে কপোতাক্ষকে তিনি কোনো দিনই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—ইহার নিসর্গ সৌন্দর্য্য তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে এমনই গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত পরবর্ত্তী কালেও সেই অপরূপ দৃশ্য—

They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude.

সুদূর ফরাসী দেশে অবস্থানকালে কপোতাক্ষের মাধুর্য্য তাঁহার মানসনেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে উল্লসিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি তাঁহার অন্তরের সেই নিবিড় আনন্দ ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন—

সতত হে নদ! তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোকে নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি শান্তির ছলনে!
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে!
আর কি হে হবে দেখা? যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে!

মধুসূদনের কবিচিত্তের উপর কপোতাক্ষ কি অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা এই একটি মাত্র কবিতা হইতে বুঝা যাইবে। বিদেশে বসিয়াও জন্মভূমির নদীটির সৌন্দর্য্য তাঁহার অন্তরকে আলোড়িত করিয়াছে—তিনি সেখানে বসিয়া 'দুগ্ধস্রোতোরূপী' নদের কলকল ধ্বনি শুনিয়াছেন এবং সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যের মাঝে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যাকুল বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিতাটির মধ্য দিয়া মধুসূদনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কবিহৃদয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সঙ্গীত, অধ্যয়ন এবং কাব্যানুশীলনে মধুসূদনের অসীম অনুরাগ ছিল বালক বয়স হইতেই। বাল্যকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর ছিল এবং তিনি গান গাহিতে পারিতেন। গান গাহিতে গাহিতে গানের দুই-একটি চরণ ভুলিয়া গেলে তিনি নিজেই তাহা পূরণ করিয়া লইয়া গাহিয়া যাইতেন। সময়ে সময়ে স্বরচিত গান তিনি তাঁহার সঙ্গী-দিগকে শুনাইতেন। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির পরি-চায়ক। সঙ্গীতানুরাগ ভিন্ন মধুসূদনের অধ্যয়নের প্রতিও অসীম অনুরাগ ছিল।

বাল্যে গ্রামের পাঠশালায় এবং যৌবনে হিন্দু কলেজে—জীবনের সকল অবস্থাতেই অধ্যয়নের প্রতি তাঁহার একটা প্রবল আসক্তি লক্ষিত হইয়াছিল। জ্ঞানার্জ্জনে কখনও কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে তিনি ভালবাসিতেন না। অধ্যয়নের প্রতি এইরূপ একটা আসক্তির ফলেই তিনি উত্তরকালে একজন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হইতে পারিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহ আয়ত্ত করিয়া মধু-সূদন সেই সকল ভাষার কাব্য ও সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় কাব্য ও সাহিত্য তাঁহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে পঠদ্দশাতেই পাশ্চাত্য কবিদিগের মত একজন শ্রেষ্ঠ কবি হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এই

আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে কাব্যরচনার প্রেরণা জোগাইয়াছিল। পাশ্চাত্য কাব্যের অনুশীলন তাঁহার ভাবসম্পদ বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্যালয়ে পঠদ্দশাতেই তিনি ইংরেজ কবি বায়রণ, মুর, স্কট্ প্রভৃতির আদর্শে ইংরেজিতে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি পাশ্চাত্য কাব্যের সহিত নিবিড় পরিচয় লাভ করেন। পাশ্চাত্য কাব্যের অনুশীলন দ্বারা তাঁহার কবিজীবন আরম্ভ হইয়াছিল ও বিকাশলাভ করিয়াছিল। ইউরোপীয় কাব্যরস আস্বাদন করিয়া বাংলা কাব্যের ভিতর দিয়া ইউরোপীয় কাব্যের মনোহারিত্ব ও কল্পনাদর্শ প্রবাহিত করাইয়া দিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সুচনা করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু কলেজে শিক্ষাও মধুস্থদনের কবিত্ব উন্মেষে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। এ সম্পর্কে ডিরোজিয়োর শিক্ষাদান ও তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের উপরে তাঁহার প্রভাবের কথা আসিয়া পড়ে। পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং দর্শনে ডিরোজিয়োর অসাধারণ অধিকার ছিল এবং তখনকার ছাত্রমহলে তিনি অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সুনিপুণ অধ্যাপনায় ছাত্রদিগের মনোবৃত্তি অতি সহজেই বিকশিত হইত। ইঁহার শিক্ষাগুণে বহু ছাত্র পরবর্ত্তীকালে যশ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সে যুগের বহু মনীষী মহাত্মা ডিরোজিয়োর শিষ্য। ডিরোজিয়োর শিক্ষায় তখনকার যুবকবৃন্দ পাশ্চাত্য ভাবের ভাবুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের সহিতও ইঁহারা যে সবিশেষ পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন তাহাও মহাত্মা ডিরোজিয়োর শিক্ষার ফল। হোমার, ভার্জিল, দান্তে এবং মিল্‌টনের কাব্য অনুশীলন করিয়া এ যুগের যুবকগণ নূতন কাব্যরসের সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত কেবল পরিচিত হওয়া নহে—ইংরেজি

ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা সেকালের যুবকবৃন্দের মধ্যে অনেকেরই হইয়াছিল। সুতরাং হিন্দু কলেজে ডিরোজিয়োর শিক্ষার ভিতর দিয়া বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য কাব্যরস-পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এইরূপে ইংরেজি সাহিত্যের ভাবরাশি এদেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্য ও পদ্যসাহিত্যে এক অভূতপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হইয়া বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

মধুসূদন অবশ্য সাক্ষাৎভাবে ডিরোজিয়োর ছাত্র ছিলেন না – ডিরোজিয়োর কলেজ ত্যাগের কিছুদিন পরে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু হিন্দু কলেজে ডিরোজিয়োর প্রভাব তখনও অন্তর্হিত হয় নাই। বাংলার যুবক-সম্প্রদায়ের চিন্তাশক্তির মূলে তিনি যে প্রেরণা দিয়া গিয়াছিলেন তাহা সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ডিরোজিয়োর শিক্ষায় বাঙ্গালীর মন সর্ব্বসংস্কারমুক্ত হইয়াছিল। হিন্দু কলেজকে এবং বাংলার যুবকসমাজকে তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন। সেই আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া মধুসূদনও পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রতি অতি সহজেই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কলেজে প্রবেশ করিয়া মধুসূদন ডিরোজিয়োকে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত আদর্শকে পাইলেন এবং সেই আদর্শকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। একদিকে ডিরোজিয়ো প্রবর্ত্তিত আদর্শ, অপরদিকে ক্যাপ্‌টেন রিচার্ডসন্ নামক জনৈক কবি-অধ্যাপকের সাহচর্য্যে আসিয়া মধুসূদন কবিত্ব লাভ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছিলেন। কবি কাব্যের অধ্যাপনা করিবেন, ইহাতে সুফল ফলিবে না ত কি? রিচার্ডসন্ ছিলেন কবি। ডিরোজিয়োর মত তাঁহার শিক্ষাও তৎকালীন যুবক-সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য কাব্যরসপিপাসু করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার ভাবুকতা মধুসূদনের কল্পনাজগতের পথপ্রদর্শক হইল। ইঁহারই শিক্ষায় এবং অনুপ্রেরণায়

পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচয় লাভ করিয়া মধুসূদন পরবর্ত্তীকালে বঙ্গসাহিত্যের শ্রী সম্পাদন করিয়াছিলেন।

রামায়ণ মহাভারতের অনুশীলনও মধুসূদনের কবিত্ব উন্মেষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। ঐ দুইখানি মহাকাব্য কবিকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাল্যেই রামায়ণ মহাভারতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ, আর কাশীরাম দাসের মহাভারত—এবং পরবর্ত্তী জীবনে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও তাঁহার সেই রামায়ণ মহাভারত প্রীতির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। পূর্ণ বয়সে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু কবির কাব্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন—বাল্মীকি হোমার ভাজিল দান্তে ট্যাসো মিল্‌টন্ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় কবির কাব্যের সৌন্দর্য্য তিনি আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন—কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত এই দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল—ঐ দুইখানি কাব্য তাঁহার চির-সহচর ছিল। স্বদেশে বিদেশে তিনি অনুরাগের সহিত গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিতেন। মাদ্রাজে প্রবাসকালে তিনি অধিকাংশ সময় রামায়ণ মহাভারত অনুশীলন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন তিনি ইংরেজি রচনা ছাড়িয়া বাংলা নাটক কাব্য প্রভৃতি রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন রামায়ণ ও মহাভারত হইতেই তিনি রচনার উপকরণ আহরণ করিয়াছিলেন। ভাষাশিক্ষা এবং পৌরাণিক বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক বিষয় মধুসূদন কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় সকল নাটক কাব্য ও খণ্ড-কবিতার আখ্যায়িকা, এমন কি চরিত্র প্রভৃতির আদর্শও প্রধানতঃ রামায়ণ মহাভারত হইতেই গৃহীত।

স্বদেশীয় কাব্যের মধ্যে কেবল যে রামায়ণ মহাভারতের সহিত মধুসূদন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। স্বদেশীয় সাহিত্যের অন্যান্য বহু কবির কাব্য অনুশীলন করিয়া তিনি আনন্দ ও

প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, জয়দেব, কালিদাস প্রভৃতি স্বদেশীয় কবিগণের প্রতি মধুসূদন অসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। স্বীয় মাতৃভূমির এই সকল কবির কাব্যরসও মধুসূদন ভাল করিয়াই আস্বাদন করিয়াছিলেন। এইরূপ অশেষবিধ উপায়ে মধুসূদনের প্রকৃতিদত্ত কবিত্বশক্তি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছিল।

মধুসূদনের আবির্ভাবকালে বাংলা সাহিত্য

মধুসূদনের আবির্ভাবকালে বাংলা সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা উপলব্ধি না করিলে বাংলা কাব্যসাহিত্যের পুষ্টি ও পরিণতি-সাধনে মধুসূদনের দান যে কতখানি তাহা উপলব্ধি করা কঠিন হয়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের কিরূপ অবস্থায় মধুসূদনের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা প্রথমে উপলব্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন।

মধুসূদনের আবির্ভাব হয় বাংলার জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধি-ক্ষণে। সে যুগ বাংলা সাহিত্যেরও এক যুগসন্ধিকাল। বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য আর আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মধ্যবর্ত্তী কালকে বলা হয় যুগসন্ধিকাল। এই যুগ হইতেছে ভারতচন্দ্র আর রামপ্রসাদের পরে এবং মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্ব্বে। ভারতচন্দ্রের তিরোধান হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে—আর কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোধান হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতচন্দ্রের তিরোধানকাল এবং ঈশ্বরচন্দ্রের তিরোধান-কালের মধ্যে এক ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলী ছাড়িয়া দিলে বাংলা-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কোনো কবিরই আবির্ভাব হয় নাই। এই যুগে অবশ্য গীতিকবিতা রচিত হইয়াছিল এবং তাহার পরিমাণও সামান্য নয়। কিন্তু সে-সকল গীতিকবিতার মধ্যে ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য ছিল না। আমরা কবিওয়ালাদিগের গান, টপ্পা রচয়িতা-দিগের সঙ্গীতাবলী এবং পাঁচালীকার প্রভৃতিদের কথা বলিতেছি। ইঁহাদের গীতিগুলি একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার জনসমাজের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিল। এই গীতিগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন—

"এই কবির গান এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল ; তৎপূর্ব্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।"

এই সকল গানের ভাষা ছন্দ রাগিণী—তাহাও যেন একটু কৃত্রিম। বৈষ্ণব কবিতায়, অথবা কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্রের কবিতার ভাষা ও ছন্দে যে নিপুণতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহার যেন একান্ত অভাব এই সকল গীতিকবিতায়। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বকালের গানগুলি, হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতঃই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেইজন্য রচনার কোন অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না; তার ভাষা ছন্দ রাগিণী, সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন, কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল। তখন গুণিসভায় গুণাকর কবির গুণপণা প্রকাশ সার্থক হইত।

"কিন্তু ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন, কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্ব্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্ম্মক্লান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদ উত্তেজনা চাহিত। তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কেবল যে এই যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত কবির গান-ওয়ালাদের প্রতিই প্রযোজ্য তাহা নহে। কবির গান, টপ্পা এবং পাঁচালী গান রচয়িতা সকলেই জনসাধারণের সাময়িক চিত্ত-বিনোদনের জন্য এই যুগের সঙ্গীত রচনা করিতেছিলেন। ফলে এই যুগের গানগুলির মধ্য দিয়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরস উৎসারিত হয় নাই।

যমকানুপ্রাসের প্রাচুর্য্য এবং অশ্লীলতা এই যুগের গীতিকবিতার অন্যতম বিশিষ্টতা। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার পাঠকসমাজে একটু নূতন ধরণের কাব্যরস পরিবেশন করিতেছিলেন। কিন্তু সে যুগে পাশ্চাত্য ভাষা এবং সাহিত্যের প্রভাব—এমন কি

পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতির প্রভাব পর্য্যন্ত বাংলার সাহিত্য ও সমাজে রীতিমত আলোড়ন আনিয়াছিল। পাশ্চাত্য-সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য সমাজের রীতি-নীতির সহিত সেই যে একটা সংস্পর্শ সেই যুগে ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে বাংলার সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও সাহিত্যে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন দেশের কুপ্রথা-সমূহের মূলোচ্ছেদ হইতেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ক্রমশই ব্যাপকভাবে দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তখন সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি সমস্ত দিকেই একটা পরিবর্ত্তন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর পুরাতন রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে। বাঙ্গালীর মনে এক নূতন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া তাহাদিগকে নূতন উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

ঠিক এই যুগে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যসাহিত্য তখন শক্তিশালিনী ও সজীব ভাবধারার বাহন হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা গদ্য ঠিক এই যুগেই ধর্ম্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য সকল প্রকার ভাব-প্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রণালীতে ও পাশ্চাত্য ভাবে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলা গদ্যসাহিত্য এক অভিনব পথে তখন পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের কোনও উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয় নাই। পাশ্চাত্য কবিগণের অনুসৃত আদর্শ, অথবা পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের অভ্যন্তরে যে রসধারা প্রবাহিত সেই সৌন্দর্য্য বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত করাইয়া দিবার জন্য বাংলায় তখনও তেমন কোনও প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হয় নাই।

যে যুগে বাংলা গদ্যসাহিত্যের যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন ও সংস্কারসাধন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—ঠিক সেই যুগে বাংলা সাহিত্যের

পদ্য-বিভাগে গুপ্তযুগ। অর্থাৎ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে তখনও অপ্রতিহত। অবশ্য ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার অনুসরণকারী পরবর্ত্তী যুগের কবিগণ আদিরসের প্লাবনে বাংলা সাহিত্যকে যে ভাবে পঙ্কিল করিয়া গিয়াছিলেন, কেবলমাত্র ঈশ্বর গুপ্তই তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া হাস্যরস পরিবেশন করিয়া বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের রুচি পরিবর্ত্তন ও তৃপ্তিসাধন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ মধ্যবয়স্ক এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের কাব্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট্। অপেক্ষাকৃত নব্যবয়স্ক এবং ইংরেজি শিক্ষিতগণও তাঁহার কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তাঁহার কবিতা একেবারে ইংরেজি প্রভাব-বর্জ্জিত ছিল না। ইহা ভিন্ন, তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া যে ব্যঙ্গরস এবং realism বা বাস্তবতা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ প্রাচীন এবং ইংরেজি-শিক্ষিত নবীন—এই উভয় সম্প্রদায়কেই যথেষ্ঠ মুগ্ধ করিয়াছিল।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সেই নবযুগের ইংরেজিশিক্ষিত ইংরেজি কাব্যরসপিপাসু সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি সাধনে অক্ষম ছিল। ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তীকালে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে আদি-রসের প্লাবন বহিয়াছিল ও যমকানুপ্রাসের প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছিল, গুপ্ত কবির কবিতার হাস্যরসাত্মক realism তাহার মূলোৎপাটন করিয়া-ছিল সত্য। কিন্তু গুপ্ত কবির কবিতাও একেবারে অশ্লীলতাদোষ-বর্জ্জিত ছিল না। বিশুদ্ধ রুচির অভাবে, যমকানুপ্রাসের প্রাচুর্য্যে আর স্থানে স্থানে অর্থহীন শব্দবিন্যাসের জন্য তাঁহার কবিতা ঐ যুগের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি করিতে পারে নাই। সে যুগের যুবকগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্য কাব্যরসপিপাসু হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের অসাধারণ প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সাধ্য ছিল না যে তিনি তাঁহার কবিতার সাহায্যে বাংলার ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের কাব্যরসপিপাসা মিটান।

সে যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শ আদ্যোপান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। তখন সাহিত্যরসিকগণের আদর্শ এত উন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল যে, ভারতচন্দ্র অথবা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তাঁহাদিগের আর মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছিল না। বাংলাভাষার দীনতা সকলকে পীড়িত করিতেছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভিতরে যে ধরণের কবি-দৃষ্টি ও কলানৈপুণ্য আছে বাংলা সাহিত্যের অভ্যন্তরে তাহাকে প্রবর্ত্তিত করা সেই নবযুগের প্রধান সমস্যা ও সাধনার বিষয় দাঁড়াইয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যের এই অবস্থাসঙ্কটে—সেই নবযুগের সমস্যা মিটাইবার জন্য এই সময় দুইজন পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত কবির আবির্ভাব হয়। একজন কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—অপরজন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। উভয়েই উভয়ের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু সাহিত্যজগতে মধুসূদনের পূর্ব্বে রঙ্গলালের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। ইঁহার প্রথম কাব্য 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে—অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের তিরোধান হয় যে বৎসরে সেই বৎসর। রঙ্গলাল যুগসমস্যা উপলব্ধি করিয়া যুগপ্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ পদ্মিনী-উপাখ্যানের ভূমিকায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এখানে প্রণিধান-যোগ্য।—

"আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গালা সমাচার পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সেই উক্ত প্রকার পদ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি। উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি।···ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য্য কবিতা-কলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবে।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রঙ্গলাল যুগ-প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সেই নবযুগের কাব্যসাহিত্য পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ অনুযায়ী রচিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের পরে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে 'ব্রীড়াশূন্য কদর্য্য কবিতা-কলাপ' আরম্ভ হইয়াছিল রঙ্গলালই বাংলা কাব্যসাহিত্যক্ষেত্র হইতে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এবিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত অপেক্ষা রঙ্গলালের কৃতিত্ব অধিকতর। তিনিই সাহিত্যে নির্ম্মল কিরণপাত করিয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যে শুচিতা ও শীলতা আনয়ন করিয়াছিলেন। ভাবের পরিছন্নতা ও বিষয়বস্তুর গৌরব—দুই বিষয়েই তিনি বঙ্গসাহিত্যের এই নবযুগের অগ্রদূত। যে স্বাদেশিকতা আধুনিকতার লক্ষণ—তাঁহার কাব্যে তাহাও উৎসারিত হইয়াছে। কাব্যের বিষয়বস্তুর জন্য অলৌকিক পৌরাণিক কাহিনীসমূহ মন্থন না করিয়া তিনি রাজপুতানার স্বাধীনতার কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই হেতু তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বপ্রশংসা বিঘোষিত হইয়াছে। তাঁহার 'শূরসুন্দরী' কাব্যে ইউরোপীয় কবিগণের অনুরূপ Muse-এর বন্দনা বা "কবিতা-শক্তির প্রতি" কবির নিবেদন আমরা পাইয়াছি। পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শ অনুযায়ী বর্ণনাভঙ্গী রঙ্গলালে আছে—তুলনা উপমা প্রভৃতির প্রয়োগে তিনি ভারতীয় সাহিত্যের গতানুগতিক আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছেন। নূতন ধরণের উপমা প্রভৃতির প্রয়োগ করিয়াছেন। সেক্সপীয়ার, স্কট, বায়রণ প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের ভাব উপমা ইত্যাদি তাঁহার কাব্যে আহৃত হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মদেবীতে Scott-এর Lay of the Last Ministrel-এর ছায়া পড়িয়াছে, তাঁহার শূরসুন্দরীতে স্কট বায়রণের প্রভাব রহিয়াছে। সেক্সপীয়ারের কাব্যের অনেক উৎকৃষ্ট অংশের তর্জ্জমা তাঁহার পদ্মিনী উপাখ্যানে আছে।

কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যসমূহে উল্লিখিত গুণসমূহ—বিশেষতঃ

পাশ্চাত্যপ্রভাব থাকিলেও—সেগুলি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতগণের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে নাই। উহাদের মধ্যে এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল না, যাহাতে ইংরেজি কাব্যরসপিপাসু ব্যক্তিগণ পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ হইতে পারেন। তাঁহার রচনায় বিষয়গৌরব ছিল, ইংরেজি প্রভাব ছিল, শুচিতা ছিল, নূতন সৃষ্টির আবেগ ছিল। তথাপি তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার যে কামনা মনোমধ্যে পোষণ করিয়া 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে কামনা সার্থক হয় নাই। তাঁহার কাব্য বিষয়বস্তুতে Scott এবং Byron-এর Metrical Romance-এর শ্রেণীর হইয়াছিল বটে। কিন্তু তাহার Form হইয়াছিল মঙ্গলকাব্যের ন্যায় এবং ইংরেজি Verse tale-এ যেটুকু Romantic ভাব আছে, যাহার জন্য এই শ্রেণীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য বা উপাদেয়তা, সেই ভাবটুকু তিনি তাঁহার উপাখ্যান-কাব্যসমূহে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। তিনি ভারতচন্দ্রীয় যুগের ভাবের সংস্কর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাষার মাধুর্য্য তাঁহার কাব্যে একান্ত অভাব। ভারতচন্দ্রের ভাষা মার্জ্জিত, পরিচ্ছন্ন—কিন্তু রঙ্গলালের ভাষা মাধুর্য্যবিহীন। অপ্রয়োজনে তিনি অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহাব করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের ভাষায় melody-র অভাব ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে হেম নবীনের ভাষায় যে গতিবেগ আছে, রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে তাহা নাই। তাঁহার কাব্যে ইংরেজ কবি সেক্সপীয়ার, বায়রণ প্রভৃতির কাব্যের অংশবিশেষের তর্জ্জমা আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেই সব তর্জ্জমা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে—মূলের মাধুর্য্য তাহারা হারাইয়াছে।

সুতরাং যুগসমস্যা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেও রঙ্গলাল সম্পূর্ণভাবে যুগসমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না। সাহিত্যজগতে যে পরিবর্ত্তন বা সংস্কার প্রয়োজন ছিল রঙ্গলাল তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধন করিতে অকৃতকার্য্য হইলেন। তথাপি কাব্যের

মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেম উৎসারিত করার জন্য, বিষয়বস্তুর গৌরবের জন্য এবং সাহিত্যের শুচিতাবিধানের জন্যই লোকে তাঁহার কাব্যের সমাদর করিল। কাব্যের আদর্শে বা কবি-কল্পনায় কোনও আমূল পরিবর্ত্তন রঙ্গলালের দ্বারা সম্ভব হইল না।

ঠিক এই সময়েই অসামান্য প্রতিভা লইয়া মধুসূদন বঙ্গবাণীর দেউলে আবির্ভূত হন। রঙ্গলাল ও মধুসূদনের কাব্য-সাধনা প্রায় একই যুগে আরম্ভ হইলেও বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রতিভাদীপ্ত দান রঙ্গলাল অপেক্ষা সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল। মধুসূদন হিন্দু কলেজে ও বিশপস্‌ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজি, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যন্তরে যে সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—আস্বাদন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালেও তিনি অন্যান্য আর কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন—বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থও তিনি অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তিনি বাংলায় রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেখা গেল পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ তাঁহার সাহিত্যে সমাহৃত। বাংলা সাহিত্যকে নূতন সম্পদে ভূষিত করিয়া তিনি নূতন পথে জয়যাত্রা করাইলেন। বিদেশী সাহিত্য হইতে আখ্যায়িকা, ভাব, কল্পনাভঙ্গী, বর্ণনাভঙ্গী এমন কি ছন্দ পর্য্যন্ত আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে তিনি নূতন আকর্ষণী শক্তি সঞ্চার করিলেন। প্রকৃতিদত্ত শক্তি, প্রতিভা এবং অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার এই নবীন কবি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করিলেন—গাম্ভীর্য্যে ও ভাববৈচিত্র্যে বঙ্গসাহিত্য সেই প্রথম সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অবশ্য গুপ্তকবি স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে এবং রঙ্গলাল তাঁহার অধীত বিদ্যার সাহায্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব অনুভব করিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে নিজেদেরকে সেই শক্তির দ্বারা পরিচালিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম বাংলা কাব্যসাহিত্যের অভ্যন্তরে পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্রোতটিকে বেশ ভাল করিয়া প্রবাহিত করাইয়া দিয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক নবযুগের উদ্বোধন করেন। ফলে যে সকল ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের দৈন্য দেখিয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং হতাশ হইয়াছিলেন তাঁহাদের দৃষ্টি বঙ্গসাহিত্যের দিকে ফিরিল।

মধুসূদনের সাহিত্যসৃষ্টির পর হইতে বাংলা সাহিত্য এক নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। বাংলা ভাষা গাম্ভীর্য্যে ও ভাব-মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনিই প্রথম দেখাইলেন বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা—দেখাইলেন বাংলা ভাষায় কেবল বাঁশীর মৃদু-মধুর গুঞ্জরণ অথবা বেণুবীণানিক্বণ ধ্বনিত হয় না। প্রতিভাশালী লেখকের হস্তে ইহার ভিতর দিয়া ভেরীর সুগম্ভীর রবও প্রকাশিত হইতে পারে। মধুসূদন তাঁহার বিভিন্ন কাব্য রচনা করিয়া একথাও প্রমাণ করিয়া গেলেন যে বাংলা ভাষা নির্জীব নহে। এ ভাষা সজীব ভাব-ধারার বাহন হইতে পারে। দৃঢ়তায় ও স্থিতিস্থাপকতায় এ ভাষা অন্য যে কোনও ভাষার সমকক্ষ।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে মধুসূদনই ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক কবি। তিনিই বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়াছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে বর্ত্তমানে যে যুগ চলিয়াছে তাহার উদ্বোধন করেন মধুসূদন।

আধুনিক যুগের উন্মেষে বাংলা গদ্যের শক্তি আবিষ্কার করেন বিদ্যা-সাগর, অক্ষয়কুমার আর বঙ্কিম। কিন্তু মধুসূদন আবিষ্কার করেন বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি।

মধুসূদনের আবির্ভাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে অভিনব শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করি—

"প্রথম আরম্ভে ইংরেজি শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালী যুবক গ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষা তখন সংস্কৃত পণ্ডিত ও বাংলা পণ্ডিত দুই দলের কাছেই ছিল অপাংক্তেয়। এই অহঙ্কারের মূলে ছিল পশ্চিম মহাদেশ হ'তে আহরিত নূতন সাহিত্য-রস-সম্ভোগের সহজশক্তি। অনেক কাল মনের জমি ঠিক মতো চাষের অভাবে ভরা ছিল আগাছায়, কিন্তু তার অন্তরে অন্তরে সফলতার শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন। তাই কৃষির সূচনা হবামাত্রই সাড়া দিতে সে দেরি করলে না। পূর্ব্ব কালের থেকে তার বর্ত্তমান অবস্থার যে প্রভেদ দেখা গেল তা দ্রুত এবং বৃহৎ। তার একটা বিস্ময়কর প্রমাণ দেখি রামমোহন রায়ের মধ্যে। বাংলা ভাষায় তখন সাহিত্যিক গদ্য সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে নদীর তটে সদ্যশায়িত পলিমাটির মতো। এই অপরিণত গদ্যেই দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বালোচনার ভয়াবহ ভিত্তি সংঘটন করতে রামমোহন কুণ্ঠিত হলেন না।

"এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসমসাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য হোমার-মিল্‌টন-রচিত মহাকাব্যসঞ্চারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই শুদ্ধ থাকতে পারেন নি। আষাঢ়ের আকাশে সজল নীল মেঘপুঞ্জ থেকে গর্জ্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠ্‌ল মাত্র, কিন্তু আনন্দ-চঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলে সাড়া দিলে আপন কেকাধ্বনিতেই। মধুসূদন সঙ্গীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা, তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গম্ভীর সুরের নানা তার চড়িয়ে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নূতন, একমাত্র তাঁরই আপন-গড়া। কিন্তু তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হলো না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘর-মন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হলো আধুনিক কাব্যে 'রাজবদ্ উন্নতধ্বনি'। কিন্তু তাকে সমাদরে আহ্বান করে নিতে বাংলা দেশে অধিক সময় তো লাগে নি। অথচ এর অনতিকাল-পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের যে নমুনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর কি সুদূর তুলনাও চলে?

"নবযুগের প্রাণবান্ সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি সেই নবপ্রভাতে উদ্বোধিত হলো, অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা

পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা মনে করলে না। আপন শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলা ভাষার 'পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন। বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্ব্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্যে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে মধুসূদন নিঃসঙ্কোচে যে-সব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন, সেও নূতন; বাংলা পয়ারের সনাতন সমদ্বিভক্ত আল ভেঙ্গে দিয়ে তার উপরে অমিত্রাক্ষরের যে বন্যা বইয়ে দিলেন, সেও নূতন। আর মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য রচনার যে রীতি অবলম্বন করলেন, তাও বাংলাভাষায় নূতন। এটা ক্রমে ক্রমে পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে সাবধানে ঘটল না, শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্ত্তে ঝড়ের পীঠে—প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙ্গে।" —(বিচিত্রা, মাঘ ১৩৪১)।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম দান 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।' 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' মধুসূদনের প্রথম কাব্য বটে। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হয় নাটক রচনার মধ্য দিয়া। তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে এবং ঐ বৎসরই উহা সাফল্যের সহিত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। 'শর্ম্মিষ্ঠা'ই মধুসূদনের প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনা। ইহার পূর্ব্বে তিনি কেবল ইংরেজিতেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—দুই একটি বাংলা কবিতা যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কাঁচা হাতের ছাপ বর্ত্তমান ছিল। সেই সকল কবিতায় ভাষাগত ভাবগত সকল প্রকার দোষই লক্ষিত হয়। এককালে মধুসূদনের সংস্কার ছিল যে বাংলা ভাষা বর্ব্বরের ভাষা—ইহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। এ সংস্কার শুধু মধুসূদনের নয়। সেই যুগে আবির্ভূত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই এই ধারণা ছিল। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মধুসূদন প্রথমে ইংরেজিতে কাব্য রচনা করিয়া কবিযশপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে আসেন এবং নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকখানি রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার উপর মধুসূদনের যে কতখানি অধিকার তাহাও প্রমাণিত হইয়া গেল। 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক মধুসূদনের প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনা হইলেও এই নাটকে দেখা যায় যে তাঁহার প্রতিভা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বেলগাছিয়া থিয়েটারে কেবল সংস্কৃত রীতির নাটক অভিনীত হইতেছিল—নাটুকে রামনারায়ণ (তর্করত্ন) সেই সকল নাটক রচনা করিতেছিলেন। তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত জনসমাজকে

সেই সকল নাটকের ভাব ও রচনারীতি পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছিল না। সেই সময়ে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয় দর্শন করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

'শর্ম্মিষ্ঠা' মহাভারতের যযাতি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। কিন্তু উহাতে অনেক নূতনত্ব ছিল। নাটকখানিতে পাশ্চাত্য আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল। ইহার চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাবর্ণনার রীতি বঙ্গসাহিত্যে নূতনত্বের সন্ধান দিয়াছিল। ঐ সকল অভিনবত্ব লক্ষ্য করিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেলেন, সকলের দৃঢ় ধারণা হইল যে মধুসূদন-প্রদর্শিত আদর্শে নাটক রচিত হইলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে।

'শর্ম্মিষ্ঠা'র পরেই মধুসূদন 'পদ্মাবতী নাটক' নামে আর একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটকখানিও সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী রচিত হয় নাই। ইহাতে গ্রীক পুরাণের ছায়া বর্ত্তমান, এবং এই নাটকে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন ও ইহার সৌন্দর্য্যসাধন করার জন্যই মধুসূদনের নাম বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। প্রথমে 'পদ্মাবতী নাটকে'র অংশবিশেষে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করিয়া পরে ঐ ছন্দে তিনি তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র আদ্যোপান্ত রচনা করেন।

যে কারণে মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে আসিয়া মধুসূদন কয়েকজন সম্ভ্রান্তবংশীয় সাহিত্যরসিকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। মধুসূদনের সহিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রায়ই সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ-

আলোচনা হইত। মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা' রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ব্যতীত বাংলা নাটকের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সেই সময় একদিন মধুসূদন ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কথোপকথনকালে বাংলা নাটক ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা উঠিল। মধুসূদন মহারাজা যতীন্দ্র-মোহনকে বলিলেন, "যতদিন বাংলা ভাষায় অমিত্রছন্দের প্রবর্ত্তন না হইবে ততদিন বাংলা নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উন্নতির আশা নাই।" উত্তরে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, যে বাংলা ভাষার যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই ভাষায় অমিত্রছন্দ প্রবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। মধুসূদন এবার বলিলেন যে বাংলা ভাষায় অমিত্রছন্দ প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নহে। এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর হইতে হইতে শেষে মধুসূদনই অমিত্রছন্দে রচনা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। 'পদ্মাবতী নাটকে' অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগ করিয়া এবং তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যখানির আদ্যোপান্ত অমিত্রছন্দে রচনা করিয়া মধুসূদন তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য কাব্য অনুশীলন করিয়া তিনি অমিত্রছন্দের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের নিকট হইতে তিলোত্তমাসম্ভবের পাণ্ডুলিপি উপহার পাইয়া লিখিলেন—

"......I will preserve it with the greatest care in my library, as a monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poesy first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time will come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity which it so richly deserves."

আগাগোড়া অমিত্রছন্দে একখানি নাটক রচনা করিবার বাসনা

মধুসূদনের ছিল, কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দে রচিত নাটক পাছে অভিনয়োপযোগী ও সাধারণের প্রীতিকর না হয় সেই আশঙ্কায় তিনি সেইরূপ অমূল্য পরিবর্ত্তন করেন নাই।

নাটক রচনার মধ্য দিয়া মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়াছিল। নাটক রচনা করিয়া তিনি সে যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসপিপাসু দর্শকগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং শুধু নাটক রচনা করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া মধুসূদন কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ, মধুসূদন কবি ছিলেন—তাঁহার মন ছিল একান্ত কল্পনাপ্রবণ। তাই দেখি, শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী নাটক হইলেও উহাদের মধ্য দিয়া কবিত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। এই নাটক দুইখানিই রোমান্টিক, Obective বর্ণনা অপেক্ষা Subjective কল্পনাই নাটকগুলিতে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

কল্পনার আতিশয্যে—কল্পনার রঙে অনুরঞ্জিত হইয়া তাঁহার নাটকগুলি কাব্যধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নাটকের ভিতর দিয়া মধুসূদনের কল্পনাস্রোত অবাধে উৎসারিত হইতে পারে নাই। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভিতর দিয়াই মধুসূদনের কল্পনাপ্রবণ এবং সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কবিহৃদয় আপনার বিকাশলাভের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। তিলোত্তমাসম্ভব পাশ্চাত্য রোমান্টিক কল্পনাদর্শে রচিত। এই সূত্রে বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য রোমান্টিক কাব্যের আদর্শ প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এখানে কবি নিখুঁত সৌন্দর্য্যতত্ত্বের কবি।

সুন্দ উপসুন্দ কর্ত্তৃক স্বর্গজয় এবং তাহাদের বধের জন্য সৌন্দর্য্য-প্রতিমা তিলোত্তমার সৃষ্টি—এই পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া তিলোত্তমাসম্ভব রচিত। কাব্যটি চারিটি সর্গে বিভক্ত। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর দেবতারা সুন্দ উপসুন্দ নামক দৈত্যদ্বয় কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিয়াছেন। ফলে স্বর্গরাজ্য

দৈত্যগণের অধিকৃত হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র হিমাচলের এক নিভৃত শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য দেবগণ ব্রহ্মলোকে—স্বর্গে অপ্সরাগণের নৃত্য গীত ও সুমধুর বাদ্যধ্বনি নীরব হইয়া গিয়াছে। দেবলোকের এই অবস্থায় তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে। কাব্যের প্রারম্ভে কবি চির-শুভ্র তুষার-স্তূপের বর্ণনা করিয়াছেন—প্রকৃতির সেই বর্ণনা গভীর এবং বিস্ময়কর। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাত্রির অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল। কবির সন্ধ্যা-সৌন্দর্য্যবর্ণনা চমৎকার—

এবে দিনমণি দেব, মৃদুমন্দ গতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজকার্য্য অবনী মণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে! মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক হইয়া
আইল তরুর কোলে ভাসি' নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা—
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।
মৃদু হাসি' শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয় সরঃ,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
শোভিল বিমলজলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী; স্থলে শোভে বিশদবসনা
ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী
কভু না পরশে যারে।

রাত্রির আগমনেও ইন্দ্রের চক্ষে নিদ্রা নাই, কারণ তিনি স্বর্গরাজ্যচ্যুত—স্বপ্নদেবী ও নিদ্রাদেবী উভয়ে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের শত চেষ্টাতেও দেবরাজ ইন্দ্রের নিদ্রা আসিল না। তখন উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে এ অবস্থায় দেবরাজকে শান্তি দিবার মত ক্ষমতা এক শচীদেবী ভিন্ন অপর কাহারও নাই। স্বপ্নদেবী শচীদেবীকে আহ্বান করিতে গেলেন। শচীদেবীর আবির্ভাবে হিমাচলের চিরতুষারের রাজ্যে অকস্মাৎ আনন্দের সঞ্চার হইল।

আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি',
তেজোরাশি বেষ্টিতা; নাদিল জলধর,
সে গম্ভীর নাদ শুনি' আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারিদিকে; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্ব্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী;
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক কলাপ;
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইল ত্বরিতে
জুড়িয়া আকাশপথ, সুবর্ণ কদলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি
চাহে গো নিকুঞ্জ পানে, যবে ব্রজধামে
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।

... ...

উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি
ধবল শিখরে সতী আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিলা
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল—
নীলনভস্থলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি'
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি' উতরিলা,
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা ; মলয় মারুত—
ফুল কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি' কহিতে লাগিল ;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিঃশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে ! বিশাল তরু, ব্রততীরমণ,
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহু পাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারিদিকে, বীরবৃন্দ যথা,
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি' আর্দ্রিল অচলের বক্ষস্থল।
সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল সলিল পূর্ণ, সে সরে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ

ক্ষণকাল ! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী,
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল !
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি বজ্রঃতেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে !
অবিলম্বে শম্বরারি সখা ঋতুপতি
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী ।—

শচীদেবীর আগমনে অকস্মাৎ বসন্তের অবির্ভাব পাঠ করিয়া আমাদের স্মৃতিপথে কালিদাসের কুমারসম্ভবের অকালবসন্ত সমাগম বর্ণনার কথা উদিত হয়। কবির উপর (কালিদাসের মেঘদূত কাব্যখানির প্রভাবও এস্থানে অনুভূত হয়।) এই অংশে বিশ্বপ্রকৃতির বর্ণনা মনোরম। এখানে কবিত্বরস উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। কবিত্ব দেখাইয়া মুগ্ধ করা যায় এমন স্থান মধুসূদনের এই প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভবে অনেক আছে। উদ্ধৃত অংশ তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শচীদেবীর আবির্ভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের মোহ্ ভঙ্গ হইল—তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য।

এই স্থানে দ্বিতীয় সর্গের আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে কবি দেবদম্পতির ব্রহ্মলোকে গমন বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্র ব্রহ্মলোকে পৌঁছিলে দেবতাগণ তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন এবং উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। এই দেবসভায় ইন্দ্র বায়ু যম কার্ত্তিকেয় বরুণ প্রভৃতির মন্ত্রণার ভিতর দিয়া প্রত্যেকটি দেবতার চরিত্র উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অংশে প্রত্যেকটি দেবতাচরিত্র নিজ নিজ বিশেষত্বে মনোহর।

সকল দেবতাদের মধ্যে কবি ইন্দ্র চরিত্র বর্ণনায় সবিশেষ নিপুণতা ও অভিনবত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ইন্দ্র মহৎ ও উদার। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ইন্দ্রকে পৌরাণিক ইন্দ্রের হীনতা স্পর্শ করে নাই। পৌরাণিক ইন্দ্র বিলাসী ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর। কিন্তু তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ইন্দ্র কর্ত্তব্যপরায়ণ, আশ্রিতের প্রতি সহানুভূতিশীল। আশ্রিত দেবতাগণকে রক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি অনুতপ্ত। নিজের দুঃখকে তিনি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করেন। ব্রহ্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী,
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়,
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি, কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ
এ সবার দুঃখ দেব, দেখি' প্রাণ কাঁদে।

দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদিগকে তাঁহাদের বিপদে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এই অক্ষমতার জন্য তিনি অনুতপ্ত—

হায়রে, দেবেন্দ্র
আমি স্বর্গপতি, মোর আশ্রিত যে জন
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা!

বায়ু ও যম সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া দেবাসুরের সংগ্রাম মিটাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র দেবতাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সৃষ্টিধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়া ইন্দ্র শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। সৃষ্টিধ্বংসের প্রস্তাবে ইন্দ্রের উদার মন সায় দেয় নাই। তিনি তখন দেবতাগণকে তাঁহাদের মহৎ কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—

পালিতে এ বিপুল জগৎ,
সৃজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।

অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক ? (যথা ধর্ম্ম জয় তথা।)
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক কহ ?

এই সকল উক্তির ভিতর দিয়া ইন্দ্রের মহৎ অন্তঃকরণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম পৌরাণিক ইন্দ্র চরিত্রকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহাকে মহৎ ও উদাব করিয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদনেব এই আদর্শ হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যে অনুসৃত হইয়াছে—সেইজন্য বৃত্রসংহার কাব্যের ইন্দ্রচরিত্রও উজ্জ্বল।

নানাবিধ পরামর্শের পরে দেবতাগণ স্থিব করিলেন যে তাঁহারা ব্রহ্মার নিকটে গমন করিবেন—সেখানেই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় নিরূপিত হইবে। এইখানে দ্বিতীয় সর্গের সমাপ্তি হইয়াছে।

তৃতীয় সর্গে ব্রহ্মপুরীর বর্ণনা। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার স্তব করিলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—

সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈব বলে বলী,
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে! (ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে!—)

কিন্তু দেবতাগণ কিরূপে ভ্রাতৃভেদ সৃষ্টি করিবেন এই সমস্যায় পড়িলেন। অকস্মাৎ দৈববাণী হইল—

আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে!
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর জঙ্গম
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী!

অতঃপর সুদক্ষ শিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করা হইল। তিনি আসিয়া বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য হইতে তিল তিল আহরণ করিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিলেন।

অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পী-পতি
জীবাইলা কামিনীরে,—সুমোহিনী বেশে
দাঁড়াইয়া প্রভা যেন আহা মূর্ত্তিমতী !

শচীপতি তিলোত্তমাকে লইয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করিলেন। এইখানে তৃতীয় সর্গের সমাপ্তি হইয়াছে।

তিলোত্তমার সাহায্যে দেবতাগণের বিজয়লাভ চতুর্থ সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। দেবরাজ তিলোত্তমাকে সঙ্গে লইয়া বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যে সুন্দ উরসুন্দ বিহার করিতেছিল। তিলোত্তমায় পশ্চাতে বসন্ত এবং কামদেব। তিলোত্তমা অরণ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বসুধা সুন্দরী—

কুসুম রতনে
সাজিলা। সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিল কলস্বরে মদন-কীর্ত্তন।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারিদিকে, স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ
ফুলকুল সৌরভ উপহার লইয়া,
আসি' সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ রাজে।

এই সর্গে তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য কবি অতিশয় দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। (অপরিচিত কুসুমবনে হরিণীর মত কম্পিতচরণে তিলোত্তমা অগ্রসর হইতেছিল।) নিজের নূপুরশিঞ্জনে সে নিজেই চমকিয়া উঠিতেছিল—বনপত্রের মর্ম্মরধ্বনিতে মলয়বায়ুর নিঃশ্বাসে এবং কখনও বা কোকিলের কুহুরবে তিলোত্তমার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল।—

মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী।
মুহুর্মুহু চারিদিকে চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি,
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে,
মলয় নিঃশ্বাসে কভু; হায়রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে! গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে!

তিলোত্তমার পাদপদ্মের স্পর্শে বিন্ধ্যারণ্য শিহরিয়া উঠিয়াছিল—বনদেবী যেন কুসুমদাম গ্রথিত করিতে করিতে সেই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া অলকদাম তুলিয়া একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বনদেব তপস্বী—তাই তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বনমধ্যে অগ্রসর হইতে হইতে তিলোত্তমা এক সরোবরের তীরে গিয়া উপস্থিত হইল। (সেই নির্ম্মল সরসীনীরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে নিজেই মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।) এইখানে কবি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের একখানি আলেখ্য আঁকিয়াছেন। সে সৌন্দর্য্য অনবদ্য—সে সৌন্দর্য্য পবিত্র ও স্বর্গীয়! চারিদিকে সুন্দর আবেষ্টন—নির্ঝরিণীর বারি আসিয়া সেই জলাশয় সৃজন করিতেছিল, তাহার চারিদিকে শ্যামতট শত শত কুসুমের বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত—সরোবরে পদ্ম শোভা পাইতেছিল। চারিদিকে এইরূপ সুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য দিয়া গড়া সেই নারীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজি মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝরি'

পর্ব্বত বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারিদিকে শ্যামতট তার
শতরঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ
বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে!
হাসে হাসে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন! মৃদু-মন্দ রবে
পবন হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি' সীমন্তিনী
(ক্লান্ত এবে) বসিলা বিরামলাভ লোভে,
রূপের আভায় আলো করি' সে কানন।
ক্ষণকাল বসি' বামা চাহি' সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
এক দৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে! "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী
মৃদুস্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু?"—

এই দৃশ্যটি মিল্‌টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের একটি চিত্রের আদর্শে অঙ্কিত। প্যারাডাইস্ লষ্টের ঈভ্‌ও এইরূপ সরসীনীরে আপন সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনি বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

তিলোত্তমা সরোবরের তীড় ছাড়িয়া যখন কাননপথে পুনরায় অগ্রসর হইল তখন—

কত স্বর্ণলতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি,
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ; কত গুণ গুণ করি'
আরাধিল অলিদল,—কে পারে কহিতে?

আপনি ছায়া-সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে
দাঁড়াইলা—সখীভাবে ধরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত দুহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে, বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে ?)
হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী !
সাহসে সুরভি-বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহু অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন শশী ! তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা !—

সুন্দ উপসুন্দ দৈত্যবীর দুইজন তখন বনবিহার করিতেছিলেন। তাঁহারা অকস্মাৎ তিলোত্তমার বর-বপুর সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া বলিলেন—

কি আশ্চর্য্য, দেখ—
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজি ! বসন্ত কি আবার আইল ?
আইস দেখি, কোন্ ফুল ফুটি' আমোদিছে
কানন ?

তিলোত্তমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে দৈত্যভ্রাতাদ্বয় তাহাকে দেবী বলিয়া মনে করিয়াছিল।—

দেখ চাহি', ওই নিকুঞ্জ মাঝারে।
উজল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী ! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদযুগ !

দেবীর চরণ-পদ্ম সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজি!

কিন্তু তখনি—

মধু মন্মথে সম্ভাষি,
মৃদুস্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে,—
"হান তব ফুলশর, ফুল ধনু ধরি'
ধনুর্দ্ধর,..."

এই বার দৈত্যকুলের সর্ব্বনাশের বীজ উপ্ত হইল। কামান্ধ উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রবল যুদ্ধ বাধিল—যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে উভয়েই ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন। দেবতাগণ এই সংবাদে দৈত্যদেশ বেষ্টন করিয়া, দৈত্যদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিলেন। তিলোত্তমা দেবেন্দ্রের আদেশে সূর্য্যলোকে প্রস্থান করিল। দেবতাগণের স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার ও তিলোত্তমার সূর্য্যলোকে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সৌন্দর্য্যতত্ত্বের কাব্য। তিলোত্তমা সকল সম্পর্কাতীত অনাবিল সৌন্দর্য্য এবং এই কাব্য তাহারই মহিমা কীর্ত্তন। রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশীর সহিত তিলোত্তমার সাদৃশ্য আছে। উর্ব্বশী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যদেবীকে সমস্ত প্রয়োজনীয়তার সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার বিশুদ্ধিতার মধ্যে—তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিলোত্তমাতেও তাই। উর্ব্বশীর মত তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে— সে সৌন্দর্য্য বিশুদ্ধ, সকল প্রয়োজনাতিরিক্ত। উর্ব্বশীর মতই তিলোত্তমা "প্রথমেই পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।" এইরূপ সৌন্দর্য্যদেবী কামনা-রাজ্যের রাণী নহে। সেইজন্য সুন্দ উপসুন্দ ঐ সৌন্দর্য্যভোগ হইতে বঞ্চিত হইল। প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয়লালসার অতি উচ্চ স্তরে অবস্থিত—তাই Oscar Wilde বলিয়াছেন—The only

beautiful things are things that do not concern us—তাই এইরূপ সৌন্দর্য্যকে আয়ত্ত করিতে গিয়া সুন্দ উপসুন্দ ধ্বংস হইয়াছে এবং কবির সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর জয়গান সার্থক হইয়াছে। তিলোত্তমা Type of Eternal Beauty বা Absolute Beauty। তিলোত্তমার ভিতর দিয়া কবির স্বপ্নলোকবাসিনী, সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর রূপটি পূর্ণভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে মধুসূদনের সৌন্দর্য্যানুভূতি চমৎকারভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া একরূপ আদ্যোপান্তই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এবং কাল্পনিক নিসর্গ-সৌন্দর্য্যের মনোরম বর্ণনা আছে। নিসর্গসৌন্দর্য্যের আবেষ্টনের মধ্যে তিলোত্তমার উদ্ভব হইয়াছে—বসন্ত তাহার নিত্য সহচর।

সৌন্দর্য্যানুভূতিতে মধুসূদন এই কাব্যে ইংরেজ কবি কীট্‌সের সমধর্ম্মী। কীট্‌স্ নিঁখুত সৌন্দর্য্যতত্ত্বের কবি ছিলেন—মধুসূদন এই কাব্যে নিখুঁত সৌন্দর্য্যতত্ত্বের কবি। কবি কীট্‌স্ সৌন্দর্য্যের অন্য সমস্ত দিকে গৌণ করিয়া নিজের হৃদয়ে কেবল সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর আনন্দ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই ধ্যানধারণায় বিভোর ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কাব্য বিশ্বের বস্তুসমূহের রূপ রেখা বর্ণ গন্ধের অনুভূতি সম্ভোগ ও স্তুতিগানে পরিপূর্ণ।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেও অনাবিল এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা ও জয়গানই প্রধান। এখানে মধুসূদন কীট্‌সের মতই নিখুঁত সৌন্দর্য্যের আরতি করিয়াছেন—দেবতাগণ কর্ত্তৃক স্বর্গজয় উপলক্ষ্য মাত্র। তিলোত্তমাসম্ভব কবি-মানসে সৌন্দর্য্যসম্ভব কাব্য। এই জিনিসটি উপলব্ধি করিলে তবে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনায় মধুসূদনের কবি-কল্পনার বিশিষ্টতাটুকু উপলব্ধি হইবে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সৌন্দর্য্যকল্পনার অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। ভারতের অমর কবি কালিদাস এবং ইংলণ্ডের কবি

কীট্‌স্ ও মিল্‌টনের প্রভাব ইহাতে সুস্পষ্ট। মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের প্রভাবও ইহার অনেক স্থানে লক্ষিত হয়। কীট্‌সের হাইপিরিয়ানের প্রথমাংশের সহিত রাজ্যচ্যুত ও শত্রুকর্ত্তৃক তাড়িত দেবরাজ ইন্দ্রের সাদৃশ্য আছে, এবং তিলোত্তমার সৌন্দর্য্যবর্ণনা আমাদিগকে প্যারাডাইস্ লষ্টের ঈভের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী মধুসূদন এই কাব্যের প্রারম্ভেই সরস্বতী বন্দনা করিয়াছেন—

কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!
তব কৃপা—মন্দর দানব দেব বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে;
এ বাক্‌সাগর আমি মথি যতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা!
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি!
যে শরীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে,
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশির বিন্দু, মুক্তাফলরূপে!—
কহ, সতি;—কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি?

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভেও কবি বলিয়াছেন—

হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনাসুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশী কলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,

তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি।

এখানে দেখি সরস্বতীর আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে কবি তাঁহার কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেও আহ্বান করিয়াছেন। কবির এই কল্পনাসুন্দরী আর ইউরোপীয় কাব্যের Muse অভিন্ন। ঠিক এইরূপেই মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রারম্ভে কল্পনাসুন্দরী কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনা-গীতি গাহিয়াছেন।

পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত হইলেও 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' নূতনত্ব আছে অনেক। ইহার ভাষা ও ছন্দে বিশিষ্টতা আছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র ভাষা ও ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ইহার বর্ণনারীতি নূতন। এই কাব্যে কবির যে ধরণের সৌন্দর্য্যকল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও বঙ্গসাহিত্যে নূতন। পাশ্চাত্য আদর্শের রোমান্টিক কল্পনা ইহাতে বর্ত্তমান—বঙ্গসাহিত্যে ইহাই পাশ্চাত্য রোমান্টিক আদর্শে রচিত প্রথম কাব্য। এই কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে আধুনিক যুগের উন্মেষ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"বঙ্গসাহিত্যে তিলোত্তমাসম্ভবের প্রকাশকে নানাদিক দিয়াই প্রাচীন সাহিত্যযুগের সীমা বলিয়া ধরিতে হয়। ঐ সময়েই ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অবসান, এবং তিলোত্তমাসম্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গে নব-সাহিত্যযুগের আরম্ভ।" ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় যে আধুনিকতার অভাব আছে তাহা নহে; তাঁহার দেশপ্রেম এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি ইউরোপীয় প্রভাবের ফল—তিনিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আখ্যায়িকা-নিরপেক্ষ কবিতা রচনা করিয়া মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের গতানুগতিকতার স্রোতটিকে ব্যাহত করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি মধ্যযুগের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত

হইতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যের অনুপ্রাসের ঘটা এবং ভাষা ও ছন্দ সেই মধ্যযুগের সাহিত্যের আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনে আমরা পাই ভাব ভাষা ও ছন্দের আমূল একটা পরিবর্ত্তন, এবং তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে ঐ সকল নূতনত্বের প্রথম উন্মেষ। তাই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন --"আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্ব্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব।"

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে অবশ্য Human Interest নাই। এ সম্বন্ধে কবি নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

'The want of what is called 'humnan interest' will no doubt strike you at once, but must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women.'

ইহা ভিন্ন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভাব ও ভাষায় শিথিলতা লক্ষিত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ইহা কবির প্রথম কাব্য। দোষ ত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন, এই কাব্যখানিই মধুসূদনের ভবিষ্যৎ সূচিত করিয়াছিল। ভাষা ও ছন্দের উপর কবির প্রথম দখল জন্মিয়াছে এই কাব্যে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে ভাষার যেরূপ মনোহারিত্ব ও ছন্দের যেরূপ ঝঙ্কার বর্ত্তমান তাহা তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের স্থানে স্থানেও অনুভূত হইবে। কবির সৃষ্টিশক্তির ঐশ্বর্য্য এই কাব্যের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবরাশির পরিণয় সাধন করিয়াছেন সফলতার সহিত। তিলোত্তমাসম্ভব রচনা করিয়া তিনি যেন আধুনিক যুগের কাব্যসৃষ্টির আদর্শ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া গেলেন। এই কাব্যের মধ্যে

কবি আপন কবিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন, এবং এই তিলোত্তমাসম্ভবে কবির যে সৌন্দর্য্যানুভূতির সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি বঙ্গসাহিত্যে তাহা অভিনব সম্পদ। সেইজন্য কাব্যখানি সাহিত্য-রসিকের ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অমূল্য।

মেঘনাদবধ কাব্য

মাইকেল মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকৃতি তাঁহার মেঘনাদবধকাব্য। ইহারই উপর তাঁহার অমরত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত। এই কাব্যে তাঁহার প্রতিভা পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে। এখানে কবি দক্ষ স্রষ্টা। কবি ইহাতে যে উদ্দাম কল্পনা, যে বর্ণনাশক্তি এবং যে মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা মহাকবিরই উপযুক্ত। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের সম্পদ্ এই কাব্যে বর্ত্তমান—ইহা এই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মধুসূদনের পূর্ব্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রভৃতি কাব্যের মধ্য দিয়া বঙ্গসাহিত্য পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের স্রোত প্রবাহিত করাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি তেমন সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের কাব্যের মধ্য দিয়াই সর্ব্বপ্রথম সচেতনভাবে পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় কবি হোমার ও মিল্টনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন মিল্টনের কাব্যের ছন্দ, স্থানে স্থানে মিল্টনের ভাবরাশি এবং হোমার হইতে গ্রীক পুরাণের আদর্শ মেঘনাদবধে আসিয়া গিয়াছে। কবি পাশ্চাত্য কাব্যের সুর ছন্দ ও কল্পনাকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া মেঘনাদবধে পরিবেশন করিয়াছেন নববেশে সুসজ্জিত করিয়া।

মেঘনাদবধের মূল আখ্যায়িকা রামায়ণ হইতে গৃহীত। রাবণের পুত্র মেঘনাদের মৃত্যু ইহার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু কবি রামায়ণকে সর্ব্বত্র অনুসরণ করেন নাই। মেঘনাদবধে কবি প্রাচীন আখ্যান অবলম্বন করিয়া নূতন কাব্য রচনা করিয়াছেন। যেমন কালিদাস তাঁহার 'রঘুবংশে' অথবা ভবভূতি তাঁহার 'উত্তররামচরিতে' নিজেদের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন, তেমনি মধুসূদনও এই কাব্যরচনায়

তাঁহার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়া গিয়াছেন। "The Meghnad-badh of Michael Madhusudan Dutt is classic both in style and conception, though the ground-work of the plot is derived from strictly oriental sources" (আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল)! প্রাচীন আখ্যান অবলম্বন করিয়া নবীন কাব্য-রচনায় যে কতখানি কৃতিত্ব ও মৌলিকতা প্রকাশ পাইতে পারে সেক্‌স্‌পীয়ার, মিল্টন, কালিদাস, মাঘ, ভারবী প্রভৃতি জগতের বহু কবিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। প্রাচীন ইতিহাস অথবা প্রচলিত কিম্বদন্তী অবলম্বনে সেক্‌স্‌পীয়ারের বহু নাটকের উপাখ্যানভাগ কল্পিত। মিল্টনের প্রধান কাব্য বাইবেলের মূল আখ্যান অবলম্বন করিয়া লিখিত। মাঘের 'শিশুপালবধম্‌' এবং ভারবীর 'কিরাতার্জুনীয়ম্‌' এই উভয় বিখ্যাত কাব্যই প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সকল দেশের কবিগণই প্রাচীন আখ্যান অথবা পরের উপকরণ লইয়া নিজের প্রতিভার গুণে তাহাকে নূতনত্ব দান করেন, দেশ কাল পাত্রভেদে ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের বশবর্তী হইয়া কবিগণ মূল আদর্শকে নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। মধুসূদনও কাব্যসৃষ্টি করিতে গিয়া এই নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যে রামায়ণে অনুল্লিখিত বহু ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। ঐ সকল ঘটনা ও চরিত্র বিভিন্ন কবির কাব্য হইতে সংগৃহীত। কিন্তু ইহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্যহানি হয় নাই, বা কবির মৌলিকতা কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

মেঘনাদবধ-কাব্য রচনায় মধুসূদন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু কাব্য হইতে রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কবি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াও গিয়াছেন। মধুসূদন সময়ে সময়ে বরিতেন,—

My writings are three-fourths Greek.

মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে তিনি একখানি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology in the present poem. I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write, as a Greek would have done.

মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গে দেবদেবীগণ গ্রীক পুরাণের আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছে। এই সর্গের বর্ণিত বিষয় রামায়ণে নাই। রামায়ণে রামচন্দ্রের সহিত দেবগণ কোথাও প্রত্যক্ষ সহায়তা করেন নাই। কিন্তু হোমারের 'ইলিয়াডে' দেবগণকে মানবপক্ষে যোগদান করিতে দেখা যায়। 'ইলিয়াডে'র আদর্শেই কবি মধুসূদন দেবদেবীগণকে বিবদমান দুই পক্ষে সাহায্যকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সর্গের হরপার্ব্বতীর সাক্ষাৎকারের যে দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতেও গ্রীক আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কবি নিজেই লিখিয়াছিলেন—

'You will no doubt, be reminded of the fourteenth Iliad and I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it—Juno's visit to Jupiter, on Mount Ida.'

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়সজ্জা, বর্ণনারীতি প্রভৃতিতে গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট। এতদ্ভিন্ন 'ইনিড্', 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড', 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্', বাল্মিকী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

কাব্যের ভাব কল্পনা ও বিষয়বস্তুর দ্বারা মেঘনাদবধের সৌন্দর্য্যসাধন হইয়াছে।

জগতের বিভিন্ন কবির কাব্যের প্রভাব 'মেঘনাদবধ কাব্যে' বর্ত্তমান থাকিলেও এই কাব্যে অনেক নূতনত্ব আছে। রামায়ণে রামচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি আর রাক্ষসগণের প্রতি বিরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মধুসূদন রামায়ণের সেই আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের নিমিত্ত মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, সেই সময়ের শিক্ষিত সমাজের স্বদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিরাগ এবং বিদেশী সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বলা যাইতে পারে। ইউরোপ উদ্যমশীল ও বলশালী, সে কাহারও কাছে সহজে অবনত হয় না, সে স্বচেষ্টায় স্বার্থরক্ষার জন্য সতত তৎপর। এই ভাবটি ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিত যুবকদিগের মন মুগ্ধ করিয়াছিল। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মাইকেল মধুসূদন দেখিয়াছিলেন যে রাবণের চরিত্রে এমন একটি বেগ ও উদ্যম আছে, যাহা শান্ত নিরুপদ্রবে জীবনযাত্রাপ্রয়াসী রামচন্দ্রের মধ্যে নাই। এইজন্য রামচন্দ্র অপেক্ষা রাবণের প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ব। কবির এই সহানুভূতির মূলে আরও একটি কারণ রহিয়াছে, তাহা হইতেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতালাভের জন্য নানা দেশের আন্দোলন। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্রান্স্ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, জার্মানী একরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। এই সকল ঘটনা সে যুগের যুবকগণের মধ্যে স্বাধীনতালাভের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল। ইউরোপের সেই স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতালাভের আগ্রহে তখনকার সকল কবিও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন কাব্যরচনা আরম্ভ করিবার কিছু পূর্ব্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুত-জাতির

স্বাধীনতা এবং স্বদেশ রক্ষার জন্য তাহাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্ম্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। মধুসূদনও এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এমন একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন যাহাতে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন যে একজন বিদেশী সসৈন্যে আসিয়া অপরের দেশ আক্রমণ করিয়াছে এবং সেই আক্রান্ত দেশের রাজা স্বদেশ ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে হারাইয়াও অদম্যভাবে প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। এইজন্য মধুসূদনের মন রাবণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত এবং রামের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য এই কাব্যের মধ্যে উদ্যমী রাবণ ও বীর মেঘনাদ কবির সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। প্রমীলা চরিত্র এই নিমিত্তই কবির এক অপরূপ সুন্দর সৃষ্টি হইয়াছে। এই বীর নারীকে তিনি একাধারে তেজস্বিনী ও স্বামী-পরায়ণা করিয়া গঠন করিয়াছেন। আর, অপর পক্ষে রামের চরিত্র নিতান্ত হীন না করিলেও তাঁহাকে অত্যন্ত শান্ত, বিপদে কাতর ও দুর্ব্বলচিত্ত করিয়াছেন। লক্ষ্মণকে কাপুরুষ, আর দেশদ্রোহী বিভীষণকে কুলাঙ্গার করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

যুগধর্ম্ম অনুসারে মেঘনাদবধে স্বদেশপ্রীতি উৎসারিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেমমূলক কাব্য ও কবিতা রচনা আরম্ভ হয় ঊনবিংশ শতকের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মধ্য দিয়া পরে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যের মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেম উৎসারিত হইয়াছিল।

মেঘনাদবধ কাব্যের আদ্যোপান্ত স্বদেশপ্রীতির কথা আছে এই কাব্যে কবি তাঁহার নিজের স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিবাৎসল্যের কথা রাক্ষস-চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য রাক্ষসগণের প্রতি কবি আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করিতে সহজেই সক্ষম হইয়াছেন।

কাব্যের প্রথমেই রাবণ তাঁহার পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কাতর—এ সংবাদ তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—

নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—

কিন্তু দূতমুখে পুত্র বীরবাহুর বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দেশরক্ষার জন্য তাহার আত্মত্যাগের কথা শুনিয়া রাবণ গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। পুত্রের বীরত্ব শ্রবণ করিয়া তিনি পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—

সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি' কাল-ফণী
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী। চল সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু; চল দেখি' জুড়াই নয়ন।

বীরবাহুর মৃতদেহ দেখিয়াও রাবণের স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পাইয়াছে—

যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল-সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?

যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে,
তবু, বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানে সে জন,
অন্তর্য্যামী যিনি, আমি কহিতে অক্ষম।

চিত্রাঙ্গদার সহিত কথোপকথনেও রাবণের স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হইয়াছে। পুত্রশোকে শোকাকুলা চিত্রাঙ্গদা যখন রাবণকে বলিয়াছিলেন—

একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে রক্ষকুলমণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি
পাখী। কহ কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজ-ধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?

ইহার উত্তরে রাবণ বলিয়াছিলেন—

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।
... ...

এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি' রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে, বীরমাতা তুমি,
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দু-নিভাননে তিত অশ্রুনীরে !

রাবণের এই সকল উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশরক্ষার জন্য পুত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে না পাঠাইয়া তিনি নিজেই যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার স্বদেশানুরাগের পরিচয় দিতেছে।

মেঘনাদের স্বদেশপ্রেমও কবি উজ্জ্বলবর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রমোদ-উদ্যানে মেঘনাদের নিকট ছদ্মবেশধারিণী প্রভাষা ধাত্রীরূপিণী কমলা লঙ্কার দুর্দ্দশার বিষয় বর্ণনা করিলে মেঘনাদ—

ছিঁড়িলা কুসুম-দাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে ; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময় ! "ধিক মোরে"—কহিলা গম্ভীরে
কুমার ; "হা ধিক মোরে ! বৈরি দল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুকুলে।"

মেঘনাদের মাতা মন্দোদরী পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিলাপ করিতে থাকিলে বীর মেঘনাদ উত্তর দিয়াছিলেন—

নগর তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে !
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি ! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র মম ? রথী যত,
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে !

ইলিয়াড্ কাব্যে হেক্‌টরপত্নী স্বামীকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলে হেক্‌টরও এইরূপ বলিয়াছিল—

I should stand
Ashamed before the men
and long robed
Of Troy, were I to keep aloof
and shun
The conflict, coward-like,

মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল যে ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্য দিয়াই স্বদেশ-বাৎসল্য উৎসারিত হইয়াছে তাহা নহে। কবি যেখানে লঙ্কার শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা বলিয়াছেন তাহা প্রকারান্তরে ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের প্রতিবিম্ব বলিয়াই মনে হয়। যেমন—

নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি !
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট
আর রাজ-আভরণ, হে রাজ-সুন্দরি
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি' সতি।

রক্ষকুল-রবি ওই উদয় অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী।
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র—পাশুপত সম!
গুণিগণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনী-রঞ্জনরূপ দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃপতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ! ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ রক্ষঃকুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।

উল্লিখিত পংক্তি কয়টিতে কবি যেন আমাদেরই দেশের দুর্দ্দশা অপনোদনের নিমিত্ত দেশবাসীগণকে দেশের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

সোনার লঙ্কার দুর্দ্দশা বর্ণনায় কবি যে কয়টি পংক্তি দশাননের উক্তিতে বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহাতে আমাদেরই জন্মভূমির অতীত গৌরবের কথা ও বর্ত্তমান হীনাবস্থার কথা স্মরণ হয়—

কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলীতেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?

কবিগণ কল্পনার সাহায্যে তাঁহাদের কাব্যের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর চরিত্রের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অন্তররহস্য বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম। তথাপি তাঁহাদের অঙ্কিত কোনও কোনও চরিত্র তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের প্রতিবিম্বও বটে। সাহিত্যজগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দশাননের চরিত্র অঙ্কনেও মধুসূদনের নিজের হৃদয়ের ছায়াপাত হইয়াছে। কবির আত্মবিলাপ ও দশাননের বিলাপ প্রায় একই ভাবাত্মক এবং সেইজন্যই দশাননের বিলাপ এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। সেইরূপ আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, কবি তাঁহার নিজেরই স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশ-বাৎসল্যের ভাবটি পাত্র-পাত্রীগণের কথার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। লঙ্কার শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া সম-অবস্থাপন্ন ভারতের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন রামায়ণকে সর্ব্বত্র অনুসরণ করেন নাই। এই কাব্যে রাক্ষস ও বানর সকলেই মানুষ। রাম লক্ষ্মণ সীতাও দেবতা নহেন, সদ্‌গুণভূষিত মানব মাত্র। রাক্ষস ও বানরদের মধ্যেও মহামানবোচিত সদ্‌গুণরাশির অভাব নাই। মেঘনাদবধের রাবণ মহামহিমান্বিত সম্রাট্, স্নেহশীল পিতা, নিষ্ঠাবান্ ভক্ত এবং স্বদেশবৎসল বীর।

মেঘনাদের স্বদেশভক্তি ও বীরত্ব উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রমীলায় বীরাঙ্গনার তেজ ও কুলবধূর কোমলতা সম্মিলিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে। রাক্ষসপরিবারভুক্ত হইলেও তাহার চরিত্রে আমরা দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ দেখিতে পাইয়াছি। শেষ সর্গে বীরাঙ্গনা প্রমীলার সহমরণ আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক

করে। সরমা রাক্ষস-বধূ। কিন্তু সীতার প্রতি তাহার অসীম সহানুভূতি ও ভক্তি এবং রাবণের পাপের প্রতি ঘৃণা তাহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্য নয় সর্গে বিভক্ত। এই নয় সর্গে তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কবির বর্ণনাগুণে এই স্বল্পকালব্যাপী ঘটনা যেন কত দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা বলিয়া মনে হয়। মাত্র তিন দিনের ঘটনা হইলেও মেঘনাদবধে রামায়ণের সমগ্র আখ্যানের সার সংগ্রহ হইয়াছে। ইহার কারণ, কবি এই কাব্যে উপন্যাসের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। প্রাচ্য কাব্যের আদর্শ অনুসরণ করেন নাই। প্রাচ্য কাব্য ইতিহাস বা জীবনচরিতের ধর্ম্মাক্রান্ত। তাহাতে কবি বর্ণিত বিষয়টিকে প্রথম হইতে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পরিচয় দিতে দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু পাশ্চাত্য উপন্যাসে ঘটনার মধ্য হইতে প্রসঙ্গটি আরম্ভ করিয়া কৌশলক্রমে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়। মধুসূদনও মেঘনাদবধে এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। লঙ্কাযুদ্ধকালে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের বিলাপ দ্বারা কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে বটে। কিন্তু কবি রামের বনবাসের কথা, পঞ্চবটী বনে রাম লক্ষণ সীতার অবস্থানের কথা ও সীতাহরণেব কথা সুকৌশলে পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া অথবা স্বগত উক্তির দ্বারা কাব্যমধ্যে বর্ণনা করিয়া রামায়ণের সমগ্র আখ্যায়িকাটিকে প্রকাশ করিয়াছেন।

মধুসূদন পাশ্চাত্য কবিগণের আদর্শে বাগ্‌দেবী বীণাপাণির আবাহন করিয়া এই কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচ্য কাব্য নাটক প্রভৃতিতে নান্দী, স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের পর যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়, সেই রীতি পরিত্যাগ করিয়া কবি হোমার, ভার্জিল ও ও মিল্‌টনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া বীণাপাণির বন্দনা-গান গাহিয়াছেন।—

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি ; ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় পদ্মাসনে যেন
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা
তেমতি দাসেরে, আসি', দয়া কর, সতি !
... ...
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।

উদ্ধৃত শেষ চারি পংক্তির বন্দনায় সরস্বতীর ছদ্মবেশ খসিয়া গিয়াছে —এখানে কবি ইউরোপীয় কাব্যের Muse-এর বন্দনা করিয়াছেন। মধুসূদনের এই বন্দনার সহিত হোমার ভার্জিল ও মিলটন এই তিনজন ক্লাসিক কবির বাণী-বন্দনা তুলনীয় ।

হোমার তাঁহার ইলিয়াড্ কাব্যে কল্পনাদেবীর আবাহন গাহিতে গিয়া বলিয়াছেন—

Achilles' wrath to Greece the direful spring,
Of woes unnumber'd, heavenly Goddess, sing !

* * *

Declare, O Muse! in what ill-fated hour
Sprung the strife, from what offended power,
Latona's son a dire contagion spread ;
And heap'd the camp with mountains of the dead.

ওডেসি কাব্যেও হোমার বলিতেছেন—

The man for wisdom's various acts renown'd,
Long exercised in woes, O Muse, resound ;
Who, when his arms had wrought the destined fall
Of sacred Troy, and raised her heaven-built wall,
Wandering from clime to clime, observant stray'd,
Their manners noted, and their states survey'd,
On stormy seas unnumbered toils he bore,
Safe with his friends to gain his natal shore :

* * *

Oh, snatch some portion of these acts from fate,
Celestial Muse! and to our world relate.

ভার্জিল তাঁহার ইনিড্ কাব্যে Muse-এর আহ্বান করিয়াছেন এইরূপে—

Arms and the Man I sing, who forced by fate,
And haughty Juno's unrelenting hate,
Expelled and exiled, left the Trojan shore :

* * *

O Muse ! the causes and the crimes relate,
What Goddess was provoked, and whence her hate :
For what offence the Queen of heaven began
To persecute so brave, so just a man,
Involved his anxious life in endless cares,
Exposed to wants, and hurried into wars!
Can heavenly minds such high resentment show,
Or exercise their spite in human woe ?

মিল্টনও তাঁহার 'প্যারাডাইস্ লষ্ট'র প্রথমেই কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আহ্বান করিয়া কাব্যের সূচনা করিয়াছেন—

Of man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree, whose mortal taste
Brought death into the world and all our woe,

With loss of Eden till one greater Man
Restore us, and regain the blissful seat,
Sing, Heavenly Muse, that on the secret top
Of Oreb, or of Sinai, didst inspire
That shepherd, who first taught the chosen seed
In the beginning how the Heavens and Earth
Rose out of chaos;......

পাশ্চাত্য মহাকবিগণের উল্লিখিত বাণীবন্দনার সহিত মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভের বাণীবন্দনার তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে পাশ্চাত্য কাব্যালঙ্কার সম্বন্ধে কবির মনে পরিষ্কার একটা ধারণা বর্ত্তমান ছিল।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভেই কবি পাশ্চাত্য কবিদিগের আদর্শে বাগ্‌দেবীর বন্দনা করিয়া তাঁহার কাব্যের বস্তুনির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার পরে সভাস্থ রাক্ষসরাজের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা। সেই সভায় দূত বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ আনিয়াছে বলিয়া ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সভা নিরানন্দ। দূতের মুখে রাবণ তাঁহার পুত্র বীরবাহুর অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী শুনিলেন, শুনিয়া সভাস্থ সকলকে লইয়া প্রাসাদশিখরে গমন করিলেন। তথা হইতে যুদ্ধক্ষেত্র, নগর ও সাগর দর্শন করিয়া রাবণ যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা মর্ম্মস্পর্শী। পুত্রশোকাতুর রাবণের আক্ষেপের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন রাক্ষসরাজের দেশপ্রেম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে অপরদিকে তেমনি তাঁহার পুত্রস্নেহ প্রকাশ পাইয়াছে। কবির বর্ণনার গুণে অতি অল্প কথায় এই প্রথম সর্গে রাবণের স্বদেশপ্রেম আর স্নেহশীল পিতৃহৃদয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?

যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক তারে !
তবু বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্য্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
... ...
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র-কেশরী !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?”

দেশরক্ষায় পুত্র আত্মোৎসর্গ করিয়াছে বলিয়া রাবণ গর্ব্বিত, কিন্তু পুত্রস্নেহে তিনি কাতর। রাক্ষসরাজ রাবণের মধ্যেও কবি এখানে দেশপ্রীতি এবং পুত্রস্নেহ দেখিয়াছেন। রাবণ এখানে পুত্রস্নেহে বিলাপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শোকে বিহ্বল হইয়া তিনি পুত্রের বীরত্ব ও দেশপ্রেম বিস্মৃত হন নাই। রাবণ এখানে বীরপুত্রের বীর পিতা।

এইরূপ আক্ষেপের পরেই রাবণের দৃষ্টি শৃঙ্খলিত সমদ্রের প্রতি পতিত হইয়াছিল। সেই শৃঙ্খলিত সিন্ধুর দিকে চাহিয়া রাবণ যে তিরস্কার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা অতি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী এবং সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে এক অতি উৎকৃষ্ট আক্ষেপোক্তি। ছন্দের ব্যঞ্জনায় এবং বিলাপের কারুণ্যে ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট অংশবিশেষ।

রণক্ষেত্র দর্শন করিয়া রাবণ পুনরায় আসিয়া সভাস্থলে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে সহসা বীরবাহুর জননী মহিষী চিত্রাঙ্গদার করুণ ক্রন্দনধ্বনি রাবণের কর্ণে প্রবেশ করিল। পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদা সখীগণ পরিবৃতা হইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিয়া রাক্ষসরাজকে মৃদু ভৎর্সনা করিলেন। করুণ রসের উদ্দীপনে মধুসূদন যে কিরূপ নিপুণ ছিলেন, এই অংশ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাবণের প্রতি চিত্রাঙ্গদার তিরস্কারের মধ্য দিয়া করুণরস উৎসারিত হইয়াছে।

পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিয়া রাবণ যাহা বলিলেন তাহা রাবণের প্রজাবৎসলতার পরিচায়ক। রাবণ বলিয়াছিলেন,—

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি।

চিত্রাঙ্গদা পুত্রশোকে কাতরা হইলেও, তিনি বীরমাতা। তাই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রাবণ বলিয়াছিলেন যে—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশবৈরী নাশের মধ্যে অসীম গৌরব বর্ত্তমান। বীরধর্ম্ম সম্বন্ধে, দেশপ্রেমিকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাক্ষসরাজ রাবণ যে বিশেষ সচেতন ছিলেন তাহা তাঁহার উক্তির মধ্য দিয়া ফুঠিয়া উটিয়াছে। অশ্রুপাত এবং বিলাপের দ্বারা বীরধর্ম্ম কলঙ্কিত করা হয়—একথা রাবণ বলিয়াছেন।

কিন্তু রাবণের সেই সান্ত্বনা চিত্রাঙ্গদার মনঃপূত হয় নাই। বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদা পুত্রকে স্বদেশের কল্যাণের জন্য নিহত হইতে দেখিলে সান্ত্বনা লাভ করিতেন সত্য। কিন্তু অপরের পাপ তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিতে গিয়া নিজের হৃদয়ের ধনকে আহুতি দান করিলে; বীরজননীর মন প্রবোধ মানে না। চিত্রাঙ্গদার হৃদয়সর্ব্বস্ব পুত্র বীরবাহু যদি স্বাধীনতার হোমানলে নিহত হইত, তবে তাঁহার বিলাপের কারণ থাকিত না। কিন্তু তাঁহার পুত্র রবেণের অসংযত বাসনানলে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া রাবণের সান্ত্বনাবাণীতে চিত্রাঙ্গদার শোকভার লাঘব হইল না। তিনি বলিলেন—

দেশবৈরী নাশে যে সমরে
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে

কোন্ লোভে, কহ রাজা, এসেছে এদেশে
রাঘব ?..............................
...তব হৈম সিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ?............
কে কহ, এ কাল অগ্নি জ্বলিয়াছে
আজি লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।

চিত্রাঙ্গদা পতিপরায়ণা, স্নেহপরায়ণা। তাঁহার মধ্যে কোমলতা ও তেজস্বিতার এক অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়াছে দেখিতে পাই। রাবণের সান্ত্বনাবাক্যের উত্তরে তিনি যে মৃদু ভৎর্সনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার তেজস্বিতার পরিচায়ক। স্পষ্ট সত্য কথা বলিতে তিনি কুণ্ঠিতা হন নাই।

বাল্মীকি রামায়ণে এই চিত্রাঙ্গদা চরিত্র নাই। কীর্ত্তিবাসী রামায়ণেও এই চরিত্র শুধুমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু মধুসূদন নিপুণ শিল্পীর ন্যায় ইহাকে গঠন করিয়া তুলিয়াছেন —ইহাকে রূপ দিয়াছেন। ইনি শুধু সন্তানবাৎসল্যে ও পতিপ্রেমে গুণান্বিতা নহেন,—নারীর সুকোমল ললনাসুলভ বৃত্তির সহিত এক অপরূপ তেজস্বিতার সংমিশ্রণ করিয়া মধুসূদন এই চরিত্রটিতে নূতন আলোকপাত করিয়া, ইঁহাকে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

মধুসূদনের পূর্ব্বেকার বঙ্গসাহিত্যে এরূপ নারী চরিত্র বিরল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের সৃষ্ট নারীচরিত্র সতীত্বে, সত্যনিষ্ঠায়, পতিপ্রেমে বা সন্তানবাৎসল্যে সমুজ্জ্বল হইতে পারে। কিন্তু মধুসূদনেই আমরা পাই নারীর সুকোমল বৃত্তির সহিত তেজস্বিতার এক্ অপরূপ সংমিশ্রণ।

কোমলতা ও তেজস্বিতার সংমিশ্রণে মধুসূদন কয়েকটি অননুভূত নারী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। সে চরিত্র চিত্রাঙ্গদার, সে চরিত্র মেঘনাদের পত্নী প্রমীলার—সে চরিত্র বীরাঙ্গনা কাব্যের জনার। পুত্রস্নেহের মধ্য দিয়া জনা চরিত্রের কোমল বৃত্তি অভিব্যক্ত। কিন্তু বীরত্বের মহিমায় তিনি উজ্জ্বল। পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া তিনি পুত্রের বীরত্বমহিমাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেন নাই। এই শ্রেণীর নারীচরিত্রের প্রথম রেখাপাত বা উন্মেষ চিত্রাঙ্গদায়। চিত্রাঙ্গদায় যাহার উন্মেষ, প্রমীলায় যাহা পল্লবিত, জনায় তাহা পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়াছে। সেই হিসাবেও চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের বিশেষ একটা তাৎপর্য্য ও মূল্য রহিয়াছে।

চিত্রাঙ্গদার তিরস্কারে রাবণ স্থির করিলেন যে অতঃপর তিনি আর কোন পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইবেন না, নিজেই যুদ্ধে যাইবেন।—

এত দিনে (কহিলা ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষস-কুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অ-রাবণ, অ-রাম বা হবে ভব আজি।

অনন্তর যুদ্ধ সজ্জা হইতে লাগিল। তাহার বিক্ষোভে বরুণ-পত্নী বারুণীর মুক্তাময়ী গৃহচূড়া পুনঃ পুনঃ বিকম্পিত হইতে লাগিল। বারুণীর সহিত তাঁহার সখীর যে কথোপকথন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিশেষ মাধুর্য্যমণ্ডিত। রাবণের যুদ্ধসাজে—

টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে,—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,

বারুণী রূপসী বসি', মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে-স্থলে
আরাব ; চমকি' সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি'
মধুস্বরে,—কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
দেখ, থরথর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্পদিনে
বায়ুপতি ? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু যেদিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ুবৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে।
হাসিয়া কহিলা দেব,—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরী, তরঙ্গিণী বিমল সলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা ;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?
উত্তর কহিলা সখি কল কল রবে ;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণ লঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"

কহিলা বারুণী পুনঃ,—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ।

রক্ষকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণ কমলটি দিও কমলাবে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশীমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে॥"

মেঘনাদবধ কাব্যের এই অংশটি মাধুর্য্যমণ্ডিত এই জন্য যে এখানে ছন্দের মধ্য দিয়া গীতিকাব্যের অনুরূপ এক মধুর বেণুবীণা-নিক্কণ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অংশে বারুণী চরিত্র বিদেশী কাব্য হইতে অনুকৃত। হোমারের থেটিশ হইতে কবি মিলটন তাঁহার কোমাস কাব্যের স্যাব্রিনা চরিত্র সৃষ্টি করেন। মধুসূদনের এই বারুণী চরিত্র মিলটনের স্যাব্রিনার আদর্শে পরিকল্পিত। সমুদ্রের সঙ্গে সমরপ্রিয় বায়ুদলের যুদ্ধ এবং বায়ুরাজ প্রভঞ্জনের বিষয় গ্রীক পুরাণের ইওলাস এণ্ড্ ইউওস্-এর আদর্শে কল্পিত। বারুণীর সখী মুরলার নাম কবি উত্তররাম-চরিত নাটক হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বারুণী যেখানে বলিতেছেন—

কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশীমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল…

সেই বর্ণনা আমাদিগকে বিদ্যাপতির—

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যঁহা যঁহা নয়ন-বিকাশ।
তঁহি তঁহি কমল পরকাশ॥

এই বিখ্যাত পদাটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মুরলার সহিত কথোপকথনের পর লঙ্কার রাজলক্ষ্মী মেঘনাদের ধাত্রীর বেশ ধারণ করিয়া মেঘনাদের প্রাসাদোদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ এবং রাবণের যুদ্ধোদ্যমের সংবাদ জানাইলেন। মেঘনাদের প্রমোদকাননের যে চিত্র কবি এই সর্গে দিয়াছেন তাহার সহিত Tasso-র Jerusalem Delivered কাব্যের Armida-র প্যারাডাইসের সহিত সাদৃশ্য আছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যে মেঘনাদ লঙ্কাপুরীর বাহিরে প্রমোদ-উদ্যানে পত্নী প্রমীলার সহিত বিলাসে মগ্ন ছিলেন, Tasso-র কাব্যে Rinaldo মায়াবিনী Armida-র প্রেমে আবদ্ধ। মেঘনাদবধে প্রেমোন্মত্ত মেঘনাদকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে গিয়াছিলেন স্বয়ং লঙ্কার রাজ-লক্ষ্মী, মেঘনাদের ধাত্রী প্রভাষা-রূপে—আর Tasso-র কাব্যে প্রেমোন্মত্ত Rinaldo-কে যুদ্ধার্থ আর্মিডার প্রমোদভবন হইতে আনিতে গিয়াছিল Charles ও Ubaldo।

লঙ্কার দুরবস্থা শুনিয়া মেঘনাদের অন্তর আক্ষেপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার কণ্ঠের পুষ্পমাল্য ছিন্ন করিয়া যুদ্ধে যাইতে উদ্যত হইলেন এবং আক্ষেপোক্তি করিয়া বলিলেন—

… ধিক মোরে!
বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে;
এই কি সাজে আমারে? দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ? আন রথ ত্বরা করি,
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুদলে।

এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়া বীর মেঘনাদ যখন রথারোহণ করিতে যাইতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার পত্নী প্রমীলা আসিয়া স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সাশ্রুনেত্রে স্বামীর করযুগল ধারণ

করিয়া স্বামীকে যুদ্ধযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া প্রমীলার যে মিনতি তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্রের কোমল বৃত্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথম সর্গে আমরা বল্লরীর ন্যায় কোমলা প্রমীলার সহিত সাক্ষাৎলাভ করি। তৃতীয় সর্গে ইনিই বীরাঙ্গনা, দলিতা ফণিনীর ন্যায় তেজস্বিনী। প্রথম সর্গে মেঘনাদ ও প্রমীলার বিদায়চিত্র হোমারকৃত ইলিয়াডে হেক্টর ও তৎপত্নী এ্যাণ্ড্রোমেকির বিদায়-চিত্রের অনুরূপ। প্রমীলার কাতর মিনতি ইলিয়াডের বীর হেক্টরের পত্নী এ্যাণ্ড্রোমেকির অনুনয়ের অনুরূপ। ট্যাসোর কাব্যেও আমিডা পলায়িত রিনালডোর জন্য এমনিভাবেই খেদ করিয়াছিল।

কিন্তু পত্নীর কাতর অনুনয়ে বীরত্ব-দৃপ্ত মেঘনাদ নিরস্ত হইলেন না। তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি যুদ্ধযাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, পিতাকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিয়া অনুনয় করিলেন। কিন্তু রাবণের স্নেহশীল পিতৃহৃদয় পুত্রের বীরোচিত প্রার্থনা শুনিয়াও প্রথমটায় পুত্রের যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দিতে পারে নাই। প্রমীলার মত তিনিও পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তিনি বলিলেন—

> এ কাল সমরে
> নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
> বারম্বার। হায়! বিধি বাম মোর প্রতি।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রজিৎ পিতাকে যুদ্ধযাত্রায় নিরস্ত করিয়া নিজে যুদ্ধযাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। মেঘনাদকে রাবণ সেনাপতিপদে অভিষেক করিলেন। এইখানে প্রথম সর্গ শেষ হইয়াছে।

মহাদেব ও পার্ব্বতীর অনুগ্রহে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের নিমিত্ত অজেয় অস্ত্র-লাভ দ্বিতীয় সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। এই সর্গের ঘটনাবলী স্বর্গলোকে ঘটিয়াছে এবং ইহার অভিনেতা ও অভিনেত্রী দেব-দেবীগণ।

এই সর্গের ঘটনা রামায়ণ বহির্ভূত—রামায়ণে লঙ্কাযুদ্ধকালে দেবতাগণ রামচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন নাই। কিন্তু মেঘনাদবধের এই সর্গে দেবদেবীগণ প্রত্যক্ষভাবেই লঙ্কাযুদ্ধকালে রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছেন দেখিতে পাই। গ্রীক কবি হোমারের ইলিয়াডের আদর্শে মধুসূদন দেবদেবীগণকে বিবদমান দুই পক্ষে সাহায্যকারী করিয়াছেন। দেবতাগণকে বিবদমান পক্ষে সাহায্যকারীরূপে কল্পনা করা গ্রীক রীতি – সেই রীতি অনুযায়ী মধুসূদন তাঁহার কল্পনা ও বর্ণনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন এই সর্গে।

ইলিয়াডের চতুর্দ্দশ সর্গ এবং কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গের সংমিশ্রণে মধুসূদন এই সর্গ রচনা করিয়াছেন। কবি কীট্‌সের প্রভাবও মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের স্থানে স্থানে অনুভূত হয়।

সন্ধ্যার মনোরম বর্ণনার দ্বারা দ্বিতীয় সর্গের আরম্ভ হইয়াছে। মধুসূদনের কল্পনাপ্রবণতার ও কবিত্বশক্তির প্রকাশ এই সর্গের প্রথমেই বেশ সুন্দরভাবে হইয়াছে। পৌরাণিক স্বর্গের যে চিত্র কবি তাঁহার কল্পনাবলে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাও অতি মনোরম, স্বর্গীয় মাধুর্য্যমণ্ডিত। দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্বর্গলোকে সভায় উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় রক্ষকুল-রাজলক্ষ্মী ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মেঘনাদের সেনাপতিপদে অভিষেক-বার্ত্তা এবং মেঘনাদ-কর্ত্তৃক নিকুম্ভিলা যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিলেন। মেঘনাদ নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সমাপন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবকুল-প্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, ইহা উপলব্ধি করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে পার্ব্বতীর নিকটে গমন করিলেন। এইস্থানে মধুসূদন কৈলাসপুরীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও অতি মনোরম—কবিত্ব-মণ্ডিত। দেবরাজ ইন্দ্র ও শচীদেবীর প্রার্থনায় এবং রামচন্দ্রের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া পার্ব্বতীর হৃদয় বিগলিত হইল। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া অজেয় অস্ত্রসমূহ লাভ করিবার জন্য

পার্ব্বতী যোগাসন শৃঙ্গে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রতি, পার্ব্বতীর মনোরম বেশ-ভূষা করিয়া দিলেন। মোহিনীমূর্ত্তিতে পার্ব্বতী তপোমগ্ন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য কামদেবকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

পার্ব্বতীর অভিলাষ সিদ্ধ হইল—মহাদেবের প্রসাদে ইন্দ্রজিত-বধের জন্য লক্ষ্মণ অজেয় অস্ত্র লাভ করিলেন। এইখানে দ্বিতীয় সর্গের শেষ হইয়াছে।

এই সর্গে হরপার্ব্বতীর মহান্ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে। মহাসংযমী মহাদেবকে ও তপশ্চারিণী পার্ব্বতীকে কবি এই সর্গে ইলিয়াডের জুনো জুপিটারের মত কামপরতন্ত্র করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। পার্ব্বতী যেভাবে মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার চরিত্র ও চিত্র হীন হইয়াছে। মহাদেব যেরূপ সহজে কামদেবের পুষ্পশরের আঘাতে প্রেমামোদে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার চরিত্রের গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্যও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ এবং হরপার্ব্বতীর মিলনের যে দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে তাহা মধুসূদনকে কল্পনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছিল ও বর্ণনার উপকরণ যোগাইয়াছিল। কিন্তু কালিদাসের হরপার্ব্বতীর উন্নতভাব ও মহান্ চিত্র মধুসূদন রক্ষা করিতে পারেন নাই। গ্রীক কবি হোমারের আদর্শ গ্রহণ করিতে গিয়াই মধুসূদন হরপার্ব্বতীকে চরিত্রাংশে হীন করিয়া ফেলিয়াছেন। গ্রীক মহাদেবী জুনোর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ট্রয় যুদ্ধে তাঁহার ভক্ত গ্রীকগণ ট্রোজানদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া জয় লাভ করে, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ভক্তবৎসল জুপিটার প্রসন্ন থাকিতে দেব কি মানব কাহারও দ্বারা ট্রোজানদিগের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না। জুনো সেই জন্য স্বীয় পতিকে মোহিনীমূর্ত্তিতে বিমোহিত করিয়া স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি গ্রীক-রতি অ্যাফ্রোদিতি

কর্ত্তৃক মোহিনী বেশে সজ্জিতা হইয়া অলিম্পাস পর্ব্বত হইতে আইডা পর্ব্বতের উদ্দেশে গমন করিলেন—পথে নিদ্রাদেব সম্‌নসকে (Somnus) সঙ্গে লইলেন। সম্‌নস পূর্ব্ব-বিপদ স্মরণ করিয়া কাম-দেবের মতই মহারুদ্র জুপিটারের সম্মুখে যাইতে ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু জুনো তাঁহাকে অভয়দান করিলে উভয়ে মেঘাবৃত আকাশপথে অলক্ষ্যে গমন করিলেন। নিদ্রাদেব সম্‌নস আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। জুনো পতিকে বিমোহিত করিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলে পর, সমনস আপন শক্তিপ্রয়োগে জুপিটারকে গাঢ় নিদ্রাভিভূত করিয়া বার্ত্তা লইয়া সমুদ্রদেব নেপচুনের নিকট প্রস্থান করিলেন। হোমারের ইলিয়াডে এই বর্ণনা এইরূপ—

Jove to deceive, what methods shall she try,
What arts, to blind his all-beholding eye ?
At length she trusts her power; resolv'd to prove
The old, yet still successful, cheat of love;
Against his wisdom to oppose her charms,
And still the Lord of Thunders in her arms.
Swift to her bright apartment she repairs,
Sacred to dress and beauty's pleasing cares.
Thus, issuing radiant, with majestic pace,
Forth from the dome th' Imperial Goddess moves;
And calls the mother of the Smiles and Loves.

*** *** With Awe divine, the queen of love
Obey'd the sister and the wife of Jove;
And from her fragrant breast the zone unbrac'd,
With various skill and high embroidery grac'd.
In this way every art and every charm,
To win the wisest, and the coldest warm:
Fond love, the gentle vow, the gay desire,
The kind deceit, the still reviving fire,
Persuasive speech, and more persuasive sighs,
Silence that spoke, and eloquence of eyes.

This on her hand the Cyprian Goddess laid.
"Take this, and with all thy wish," she said.

She speeds to Lemnos, O'er the rolling deep,
And seeks the cave of Death's half-brother, Sleep.
"Sweet pleasing Sleep!" (Saturnia thus begun)
"Shed thy soft dews on Jove's immortal eyes,
while sunk in love's entrancing joys he lies."
"Imperial dame" (the balmy power replies),
"But how, unbidden shall I dare to steep
Jove's awful temples in the dew of sleep?
Long since, too venturous, at thy bold command,
On those eternal lids I laid my hand;
Great Jove awaking, shook the bless'd abodes
With rising wrath, and tumbled gods on gods.
Me chief he sought, and from the realms on high
Had hurl'd indignant to the nether sky;
But gentle Night to whom I fled for aid."

"Vain are thy fears", (the queen of Heaven replies
And speaking rolls her large majestic eyes):

Then, swift as wind, o'er Lemno's smoky isle,
They wing their way, and Imbrus' sea-beat soil,
Through air unseen, involv'd in darkness, glide,
And light on Lectos, on the point of Ide
Hushed are her mountains, and her forests nod.
Dark in embowering shade, conceal'd from sight,
Sat Sleep, in likeness of the bird of night.

To Ida's top successful Juno flies.
Great Jove surveys her with desiring eyes.
"Why comes my goddess from the ethreal sky,
And not her steeds and flaming chariot nigh?"

She ceased; and smiling with superior love,
Thus answer'd mild the cloud compelling Jove:
"Nor god nor mortal shall our joys behold,
Shaded with clouds, and cicumfus'd in gold;
Not e'en the sun, who darts through heaven his rays,"
Gazing he spoke, and kindling at the view,
His eager arms around the goddess threw.

Glad earth perceives, and from her bosom pours
Unbidden herbs and voluntary flowers.
Thick new-born violets a soft carpet spread,
And clustering lotus swell the rising bed,
And sudden hyacinths the turf bestrow,
There golden clouds conceal'd the heavenly pair,
Steep'd in soft joys, and circumfus'd with air.
Celestial dews, descending o'er the ground.
Perfume the mount, and breathe ambrosia round.
Now to the navy borne on silent wings,
To Neptune's ear soft Sleep his message brings.

ইলিয়াডের এই আখ্যানবস্তু কবির প্রধান লক্ষ্যস্থল হওয়ায় কুমারসম্ভবের মহোচ্চ আদর্শ হইতে কবি ভ্রষ্ট হইয়াছেন। মেঘনাদবধের হরপার্ব্বতী অবশ্য গ্রীক জুপিটার ও জুনো অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁহারা কুমারসম্ভবের হরপার্ব্বতী অপেক্ষা হীন। মেঘনাদবধে কামপরতন্ত্র জুপিটার ও দুরভিসন্ধিপরায়ণা জুনোর আদর্শ হরপার্ব্বতীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া হরপার্ব্বতীর চিত্রকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

কুমারসম্ভবে মহাদেবের চিত্র মহান্। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের উপর কামদেবের শর-নিক্ষেপের কথা কুমারসম্ভবে নাই। ঐ কাব্যে পার্ব্বতীর অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রতি ও রতিপতি-কর্ত্তৃক শিবের ধ্যানভঙ্গ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু মেঘনাদবধে গ্রীক কাব্যের আদর্শে রতি ও রতিপতির সাহায্যে পার্ব্বতী-কর্ত্তৃকই মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করা হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের এই সর্গে অন্যান্য দেবদেবীর চরিত্রও হীন হইয়া গিয়াছে। পৌরাণিক দেবতা ইন্দ্র ও লক্ষ্মী এখানে সুন্দররূপে চিত্রিত হন নাই। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে ইন্দ্র চরিত্রের যে মহত্ত্ব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা এখানে নাই। তবে কামদেব, রতি, মায়াদেবী ও শচীর চিত্র সুন্দর হইয়াছে।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলা চরিত্র মেঘনাদবধ কাব্যে নূতন। ইহা কবির কল্পনাপ্রসূত মৌলিক চিত্র। মধুসূদন রাক্ষস-পরিবারের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য তাহাদিগকে নানা গুণে ভূষিত করিয়াছেন। রাক্ষসগণের মধ্যেও তিনি স্নেহ, প্রেম, স্বদেশ-প্রীতি, দেবদেবীর প্রতি ভক্তি—এই সকল গুণ দেখিয়াছেন। ফলে রাক্ষসগণের প্রতিও আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক হইয়া থাকে। কিন্তু সকল চরিত্রের মধ্যে প্রমীলা চরিত্র হইতেই মধুসূদন রাক্ষস-পরিবারের প্রতি পাঠকের অনুকম্পা উদ্রেক করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম হইয়াছেন। প্রমীলা কুলবধূর আদর্শ, কিন্তু কুলবধূর কোমলতার সহিত বীরাঙ্গনার তেজস্বিতা সম্মিলিত করিয়া মধুসূদন এই চরিত্রটিকে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে ইঁহাকে আমরা কোমলা বল্লরীর মত দেখিয়াছি। কোমলা বল্লরীর ন্যায় ইনি ইঁহার স্বামীকে অবলম্বন করিয়াই জীবিতা ছিলেন।

সেখানে প্রমীলা অশ্রুসিক্তা এবং যুদ্ধার্থে স্বীয় পতিকে বিদায় দিতে অনিচ্ছুক। অশ্রুমতী প্রমীলা সেখানে বলিয়াছেন,—

কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
অভাগী ?

বিদায়ের প্রক্কালে পতি-বিরহশঙ্কিতা প্রমীলার এ খেদের মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই। কিন্তু কুলবধূর কোমলতার সঙ্গে বীরাঙ্গনার শৌর্য্যের যে সম্মিলন মধুসূদন ঘটাইয়াছেন সেখানেই প্রমীলা চরিত্রের নূতনত্ব, সেখানেই মধুসূদন দক্ষ স্রষ্টা। ব্রততীর মত কোমলা, বিরহবিধুরা প্রমীলা যে অবস্থা-বিপর্য্যয়ে মেঘনাদের মত বীর স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার উপযুক্তা বীরাঙ্গনা, তাহার পরিচয় দিতে তিনি বিরত হন নাই। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার এই বীরাঙ্গনা মূর্ত্তিটি সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেঘনাদ তাঁহার বিষণ্ণা পত্নীকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন যে অবিলম্বেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া প্রমীলা লঙ্কাপুরীতে যাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সখী বাসন্তী বলিয়াছিল—

কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষ অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।

উত্তরে বীরাঙ্গনা প্রমীলা যাহা বলিলেন সে উক্তি মেঘনাদের পত্নীরই উপযুক্ত।—

কি কহিলি বাসন্তি? পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি'
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষকুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে;
দেখিব কেমন মোরে নিবারে নৃমণি।

অতঃপর প্রমীলা যুদ্ধসজ্জা করিয়াছেন।—

রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা।... ... ...
... ...
সাজিলা দানববালা হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ-নিশুম্ভ, উন্মাদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বাড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি শিখা।

মধুসূদনের এই বর্ণনার সহিত ট্যাসো, ভার্জ্জিল, রঙ্গলাল প্রভৃতির কাব্যান্তর্গত বীরাঙ্গনাগণের বর্ণনা তুলনীয়।

ভার্জ্জিল তাঁহার ইনিডে (Aeneid) বীরাঙ্গনা ক্যামিলার বর্ণনা নিম্নলিখিতরূপে দিয়াছেন।—

Last Marches forth for Latium's sake
Camilla fair, the Volscian maid.
A troop of horsemen in her wake
In pomp of gleaming steel arrayed;
Stern warrior queen! those tender hands
Ne'er plied Minerva's ministries:
A virgin in the fight she stands,
Or winged wings in speed outvies.

অন্যত্র—

Wher'er she moves, from house and land
The youth and ancient matrons throng,
And fired in greedy wonder stand,
Beholding as she speeds along:
In kingly dye that scarf was dipped
'Tis gold confines those tresses' flow:
Her pastoral wand with steel is tipped,
And Lycian are her shafts and low. —Aeneid.

ট্যাসো (Tasso) তাঁহার জেরুজালেম ডেলিভার্ড কাব্যে বীরাঙ্গনা ক্লরিণ্ডার বর্ণনায় বলিয়াছেন—

Clorinda on the corner town alone,
In silver arms like cynthia shone,
Her rattling quiver at her shoulders hung,
Therein a flash of arrows feathered weel,
In her left hand her bow was bended strong
Therein a shaft headed with mortal steel.
So fit to shoot Latona's daughter stood,
When Niobe she killed and all her brood.

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পদ্মিনী উপাখ্যানের নায়িকা পদ্মিনীর বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন।—

লাজ ভয় পরিহরি ধরি প্রহরণ।
আরোহি তুরঙ্গপরি করে ঘোর রণ॥

এবং

এখানে পদ্মিনী সতী অন্তরে বিচারি।
ধরিলেন সামরিক বেশ মনোহারী॥
দুই স্কন্ধে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন।
কটিতটে খর করবাল সুশোভন॥
করে ধরিলেন শূল অতি খরশান।
পৃষ্ঠে বাঁধা অসিচর্ম্ম বর্ম্ম পরিধান॥
ধরণী-চুম্বিত চারু বেণী চিকণিয়া।
বিচিত্র কিরীটে বাঁধে করে বিনাইয়া॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা, কি কব বিশেষ।
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে প্রবেশ॥

মধুসূদনের অঙ্কিত প্রমীলাচিত্র—প্রমীলার সমরসজ্জা Tasso-র ক্লরিণ্ডা, Virgil-এর ক্যামিলা এবং রঙ্গলালের পদ্মিনী প্রভৃতির

আদর্শে কল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি মধুসূদনের চিত্র অতুলনীয় —মধুসূদনের বর্ণনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মৌলিক।

ইউরোপীয় সাহিত্যে বীরাঙ্গনার চিত্র বহু আছে। ইতালীয় কবি Tasso-র জেরুজালেম ডেলিভার্ড কাব্যের ক্লরিণ্ডা (Clorinda), গিলডিপ্পে (Guildippe) বা আরমিনিয়া (Erminia), ভার্জ্জিলের ইনিডের ক্যামিলা (Camilla), হোমারের এথিনী, বায়রণের মেড্ অব স্যারাগোসা সকল চরিত্রই বীরাঙ্গনার তেজে তেজস্বিনী এবং প্রমীলা চরিত্র-সৃজনে উল্লিখিত সকল কবির কাব্যান্তর্গত চরিত্রসমূহ মধুসূদনের আদর্শ হইয়াছিল। কিন্তু প্রমীলাচরিত্রের গঠনপ্রণালী মধুসূদনের নিজস্ব। কারণ ইউরোপীয় কাব্যসমূহের অন্তর্গত বীরাঙ্গনা চিত্রে আমরা শুধু রুদ্র ভাবেরই পরিচয় পাই। কখন তাঁহাদিগকে অশ্বারোহণে পলায়নপরা দেখি, কখন সমরাঙ্গণে রণোন্মত্তা দেখি। কিন্তু গৃহবধূর কোমলতা, রমণীর ব্রীড়াবনতা সলজ্জভাব তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কূলবধূর কোমলতা, তাহার ব্রীড়াবনত মাধুর্য্যের সহিত বীরাঙ্গনার রুদ্রতেজ বা দীপ্তির যে সংমিশ্রণ হইতে পারে, ইহা ইউরোপীয় কল্পনার অতীত। একমাত্র ভারতীয় কবির কল্পনায় এইরূপ কোমলতার সহিত রুদ্রভাবের মিলন সম্ভব। ভারতীয় কাব্যেই আমরা পাই 'পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকনম্রা পল্লবিনী লতেব' কোমলাঙ্গী গৌরী, আবার তাপসগণের আদর্শস্থানীয়া কঠোর ব্রতপরায়ণা অপর্ণা—অথবা 'কপালমালিনী খর্পর-ধারিণী শূলধরা'। মধুসূদনের কল্পনায় এইরূপ নারীমূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছে এবং প্রমীলা-চিত্রে সেই মূর্ত্তি অনন্যসুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রমীলা-চরিত্রের উৎকর্ষের জন্যই তৃতীয় সর্গটি সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে অতুলনীয় হইয়াছে।

মধুসূদনের হৃদয় ছিল বীরত্বানুরাগী। বীররস উৎসারিত করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি তাঁহার অনবদ্য সৃষ্টি মেঘনাদবধ কাব্য

রচনায় প্রবৃত্ত হন। শুধুমাত্র যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনার মধ্য দিয়া বীররস উৎসারিত না করিয়া মধুসূদন চরিত্রের মধ্য দিয়া বীররস ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই প্রয়াসের ফল মেঘনাদের মত বীর, প্রমীলার মত বীরাঙ্গনা। মেঘনাদ স্বদেশভক্ত বীর—প্রমীলা তাঁহারই উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীরূপে চিত্রিত।

সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যখানির মধ্যে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কাব্যের সৌন্দর্য্য সমাহৃত, প্রমীলা চরিত্র সেইরূপ বহু কবির কাব্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া রচিত হইয়াছে। মধুসূদনের কবি-প্রতিভা বিশ্বসাহিত্য হইতে তিল তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া তাহাতে জীবনসঞ্চার করিয়া এই তিলোত্তমাসদৃশ প্রমীলাচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুসূদন Tasso-র জেরুজালেম ডেলিভার্ড কাব্যখানি পাঠ করিতেছিলেন। ট্যাসোর কাব্যের আরমিনিয়া, ক্লরিণ্ডা আর গিলডিপ্পের চিত্র মধুসূদনকে তাঁহার কাব্যের মধ্যেও একটি বীরনারীর চরিত্র চিত্রিত করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। ইলিয়াডের রণসজ্জায় সজ্জিতা এথিনী এবং ইনিডের অশ্বারোহণ-নিপুণা সসঙ্গিনী ক্যামিলার চিত্র তাঁহার কল্পনাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। অতঃপর তিনি তাঁহার আজীবনের প্রিয় কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্ব হইতে অর্জ্জুন-বিরোধিনী প্রবীর-মাতার নাম ও চরিত্র গ্রহণ করিয়া সব চিত্র একত্র মিলাইয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব একখানি মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিলেন। প্রমীলার নাম, তাহার সখীগণের বিবরণ—এ সকলই মহাভারত হইতে গৃহীত। তবে প্রমীলা চরিত্রের রূপায়নে রঙ্গলালের অঙ্কিত পদ্মিনী চরিত্রের প্রভাব মধুসূদনের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয়। কারণ পদ্মিনীচরিত্রে যে ধরণের তেজস্বিতা, কোমলতা ও পাতিব্রত্যের সমন্বয় ঘটিয়াছে, প্রমীলার চরিত্রও অনুরূপ তেজস্বিতা, কোমলতা ও পাতিব্রত্যগুণে ভূষিত।

তবে প্রমীলাচিত্র পদ্মিনীচিত্র অপেক্ষা মনোজ্ঞ হইয়াছে। কারণ, দক্ষশিল্পী মধুসূদন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কল্পনার অপরূপ সমন্বয়সাধন করিয়া এই চরিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদনের প্রমীলায় প্রতীচ্য বীরাঙ্গনাগণের রুদ্রতেজের সহিত প্রাচ্য বীরাঙ্গনাগণের কোমল ভাবটিরও এক অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়াছে।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কব্যে বিষাদান্তক কাব্য। রাবণের করুণ বিলাপে কাব্যের আরম্ভ এবং বীর মেঘনাদের মৃত্যু ও প্রমীলার সহমরণে কাব্যের সমাপ্তি। প্রমীলার বিষাদময় অবসান বুঝিবার জন্য এবং তাহাকে করুণতর করিয়া তুলিবার জন্যই তৃতীয় সর্গে প্রমীলার চিত্র এত উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই সর্গে প্রমীলার চিত্র এরূপ উজ্জ্বল বলিয়াই, শেষ সর্গে তাহার বিষাদময় অবসান, তাহার করুণ চিত্র আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। এই সর্গের উজ্জ্বল চিত্রই শেষ সর্গের tragedy-র উপকরণ জোগাইয়াছে। এখানে প্রমীলা অশেষ গুণবতী, অসামান্যা শৌর্য্যময়ী। কিন্তু অশেষ গুণবতী এবং শৌর্য্যময়ী হইয়াও সে নবম সর্গে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়া বিনষ্টা হইল বলিয়াই প্রমীলার চিত্র এত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

কোমলতা ও বীরত্বের অপরূপ সমন্বয় ঘটাইয়া প্রমীলা চরিত্রটিকে এই সর্গে ফুটাইয়া তোলার নিমিত্ত এই তৃতীয় সর্গ সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে একটি অতুলনীয় সর্গ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু এই সর্গে রাক্ষসকুলবধূকে গুরুজনে ভক্তিমতী, পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা ও বীরাঙ্গনারূপে ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া মধুসূদন রামচন্দ্রের চরিত্রকে হীন করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাকাব্য-রচয়িতা কবির কর্ত্তব্য প্রচলিত একটা মহৎ আদর্শকে বা সংস্কারকে ক্ষুণ্ণ না করা। কিন্তু মধুসূদন রামচন্দ্র সম্বন্ধে যে মহান্ আদর্শ ভারতবাসীর মনে যুগযুগান্তর ধরিয়া বর্ত্তমান, তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন—তিনি রামচন্দ্রকে ভীরু কাপুরুষ রূপে চিত্রিত করিয়াছেন এই সর্গে। রামচন্দ্র সম্বন্ধে যে আদর্শ

আমরা আমাদের মনোমন্দিরে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি—সেই চিরাগত আদর্শ ও বিশ্বাসকে ভঙ্গ করিয়া মধুসূদন তাঁহার একান্ত নিজস্ব মনোগত আদর্শে তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে রামচন্দ্র ভীরু কাপুরুষরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গে রামচন্দ্র প্রচলিত আদর্শানুযায়ী চিত্রিত—তিনি সেখানে বিনয়ী, ধর্ম্মানুরাগী, দেবগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। কিন্তু এই সর্গে প্রমীলার শৌর্য্যে তিনি ভীত হইয়া যুদ্ধসাজ ত্যাগ করিয়াছেন। বিভীষণকে তিনি বলিয়াছেন—

দূতীর আকৃতি দেখি' ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর, যুদ্ধসাজ ত্যজিনু অমনি।
মূঢ় যে, ঘাঁটায় সখে হেন বাঘিনীরে।

মধুসূদন একটা emotion বা আবেগের অনুপ্রেরণায় তাঁহার কাব্যরচনা বা চরিত্রসৃষ্টি করিয়াছিলেন। শুধুমাত্র কবিকল্পনার তাড়নায় তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করেন এবং তাঁহার কাব্যান্তর্গত চরিত্রসমূহ সৃষ্টি করেন। এই জন্যে তাঁহার কাব্যে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির চরিত্র ভীরুতাদোষে দুষ্ট হইয়াছে। মধুসূদনের রাম লক্ষ্মণ কবির ভাব-প্রবণতার নিদর্শন বলিয়া তাঁহাদের কোমলতা ও করুণতাটুকু উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে।

মহাকাব্যের বৈচিত্র্যসাধনের জন্য পার্শ্ব-চিত্র বা শাখাকাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন। মহাকাব্যরচনায় এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গ রচনা করিয়াছিলেন এবং একটি বিচ্ছিন্ন আখ্যানবস্তুকে মূল ঘটনার সহিত সংযোজিত করিয়া কবি পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন। এই সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথন বর্ণিত এবং সেই সূত্রে কবি অতিশয় নিপুণতার সহিত রামের বনগমন হইতে সীতা উদ্ধার পর্য্যন্ত রামায়ণের মূল আখ্যানবস্তুর একখানি আলোকচিত্র তুলিয়া এই সর্গে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। জটায়ুর সহিত রাক্ষসরাজের যুদ্ধ

এবং মূর্চ্ছিত অবস্থায় মায়াদেবী কর্ত্তৃক রামায়ণের ভাবী ঘটনার ছায়াদর্শন প্রভৃতি অনেক ঘটনাই কবি অতি সংক্ষেপে সীতার মুখ দিয়া বর্ণনা করাইয়াছেন।

মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গে প্রমীলা চরিত্রে বীরাঙ্গনার যেমন একখানি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এই সর্গে তেমনিই সীতা চরিত্র মূর্ত্তিমতী কোমলতা, পবিত্রতা এবং করুণার প্রতিমূর্ত্তিরূপে চিত্রিত। প্রমীলা সৌন্দর্য্যে মধ্যাহ্ন-দীপ্তি-প্রখরা; কিন্তু সীতা মাধুর্য্যে উষা-স্নাত স্নিগ্ধশীতলা। কুলবধূর কোমলতা বীরাঙ্গনা প্রমীলার তীব্রতাকেও মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, আর সীতার মৃদুমধুর প্রকৃতিতে রাক্ষসপরিবারের প্রতি তাঁহার করুণা ও সহানুভূতি ফুটাইয়া তুলিয়া কবি তাঁহাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

সরমা সীতাদেবীর দুঃখে দুঃখিতা—নিরাভরণা সীতার প্রতি অসীম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সে যখন সীতাদেবীর অঙ্গের অলঙ্কার অপহরণের জন্য রাবণকে নিন্দা করিয়াছিল, তখন সীতা রাক্ষসরাজকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন—

> বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি,
> আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
> আভরণ, যবে পাপী ধরিল আমারে
> বনাশ্রমে···

শত্রুকে—অপহরণকারী দুর্ব্বৃত্তকে এইরূপে অকারণ দোষ হইতে মুক্ত করার চেষ্টায় সীতদেবীর চিত্র অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। সীতার মধ্যে শত্রুর প্রতিও ন্যায়বিচার করিবার মত হৃদয়ের উদারতা যে ছিল তাহা সীতার মুখের এই অল্প কথায়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সহানুভূতি-পূর্ণ এবং করুণার প্রতিমূর্ত্তি সীতাদেবীর যে চিত্রের সূত্রপাত এই সর্গে হইয়াছে, তাহা পূর্ণপরিণত ও সার্থক সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে নবম সর্গে। সেখানে মেঘনাদের মৃত্যু এবং প্রমীলার সহমরণের

সংবাদ সীতা যখন প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি নিজের মুক্তির জন্য আনন্দিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু রাক্ষসবংশের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। রাক্ষসবংশের প্রতি এরূপ অনুকম্পা রামায়ণের সীতাচরিত্রে লক্ষিত হয় না। ইহা মধুসূদনের মৌলিক সৃষ্টি। বীরাঙ্গনা প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদনের যেমন মৌলিকতা ছিল, সীতাচরিত্রাঙ্কনেও তেমনি মধুসূদনের মৌলিকতা ছিল। রাক্ষসপরিবারের দুরবস্থায় সীতাদেবী যে অশ্রুপাত করিয়াছেন তাহাতে এই অশ্রুমতী দেবী অশ্রুবিন্দুর মতই শুভ্র সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন।

পঞ্চম সর্গের দৃশ্য স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে। লক্ষ্মণ বহু বাধা অতিক্রম করিয়া দেবী মহামায়াকে পূজা করিয়া বর লাভ করিলেন, উহাই এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। সিদ্ধির পথ অতিশয় বন্ধুর ও বিঘ্নসঙ্কুল—মধুসূদন সেই অনুসারে লক্ষ্মণকে বহু বিভীষিকা, প্রলোভনের মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ করাইয়া তাঁহাকে দিয়া তাঁহার ইষ্টদেবতার বরলাভ করাইয়াছেন। প্রথমে ভীমদর্শন শূলপাণি, তাহার পর মায়াসিংহ, অন্ধকার, মেঘ-গর্জ্জন, ঝঞ্ঝাবায়ু, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, দাবানল, ভূকম্পন, সমুদ্রগর্জ্জন প্রভৃতি নানাবিধ বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণ কিছুতেই ভীত বা সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। অবশেষে কঠিনতম পরীক্ষা—যে পরীক্ষায় দেবতা ও ঋষিদিগেরও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে! অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী অপ্সরাগণ আবির্ভূত হইয়া, জলক্রীড়া দেখাইয়া, প্রণয়-সম্ভাষণ করিয়া এবং নানা হাবভাব দ্বারা লক্ষ্মণের মন হরণ করিবার চেষ্টা করিল।

অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি' অরিন্দমে
গাইল ;—"স্বাগত ওহে রঘু-চূড়ামণি!
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী!
নন্দন কাননে, শূর, সুবর্ণ মন্দিরে

করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন উদ্যানে;
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুখায় সুধারস অধর সরসে;
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে
আমা সবে; চল, নাথ আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি! রোগ শোক আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন!"

অপ্সরাগণের এই প্রলোভন জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ তাহাদিগকে মাতৃসম্ভাষণ করিলেন। ফলে তাঁহারা মিলাইয়া গেলেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গের এই বর্ণনা ট্যাসোর কাব্য জেরুজালেম ডেলিভার্ড-এর একটি বর্ণনার অনুকরণে লেখা। ট্যাসোর মহাকাব্যে দেখা যায় যে কুহকিনী আর্মিডার মায়াপুরীতে রাইনাল্ডো যখন মোহাবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন তখন Ubaldo এবং তাহার সহচর এইরূপ বিঘ্নসঙ্কুল পথের মধ্য দিয়া আর্মিডার মায়াপুরীতে পৌঁছিয়াছিলেন। ট্যাসোর বর্ণনা এইরূপ—

A liltle higher on the way they met
A lion fierce that hugely roared and cried,
His crest he reared high, and open set
Of his broad-gaping jaws the furnace wide,
His stern his back oft smote, his rage to whet,
But when the sacred staff he once espied
A trembling fear through his bold heart was spread,
His native wrath was gone. and swift he fled.

The hardy couple on their way forth went,
And met a host that on them roar and gape,
But yet that fierce, that strange and savage host
Could not in presence of those worthies stand,
But fled away, their heart and courage lost,
When Lord Ubaldo shook his charming wand.

Thay saw virgins bathe and dive,
That sometimes toying, sometimes wrestling stood,
Sometimes for speed and skill in swimming strive,
Now underneath they dived, now rose above
And ticing baits laid forth of lust and love.
The nymphs applied their sweet alluring arts,
And one of them above the waters quite
Lift up her head, her breasts and higher parts,
So vented she her golden locks forth shed
Round pearls and crystal moist therein which lies:

* * *

And her fair locks, that in a knot were tied
High on her crown, she gan at large unfold;
Which falling long and thick and spread wide,
The ivory soft and white mantled in gold:
Thus her fair skin the dame would clothe and hide,
And that which hid it no less fair was held;
Thus clad in waves and locks, her eyes divine,
From them ashamed did she turn and twine.
At last she warbled forth a treble small,
And with sweet looks her sweet songs interlaced;
'Oh happy men! that have the grace', quoth she,
'This bliss, this heaven, this paradise to see.
This is the place wherein you may assuage,
Your sorrows past, here is that joy and bliss
That flourished in the antique golden age,
Here needs no law, here none doth aught amiss;
Put off those arms and fear not Mars his rage,
Come and see our queen with golden crown,

She will admit you gently for her own,
Numbered with those that of her joy partakes.'
—Jerusalem Delivered, Tasso (BK XV)

Milton-এর Paradise Regained কাব্যেও ক্রাইষ্টকে সয়তানের প্রলোভন প্রদর্শনের বিবরণ আছে। তাহাও মধুসূদনের কল্পনা উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারে।

ইন্দ্রজিত ও প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গের বিবরণ প্যারাডাইস লষ্টের অ্যাডাম ও ঈভের নিদ্রাভঙ্গের অনুকরণে লেখা।—মেঘনাদবধের বর্ণনা এইরূপ—

কুসুম শয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিত, তথা
পশিল কূজনধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীরকুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি'
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য-কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি তোমারে
পাখীকুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি
সম এ পরাণ কান্তে; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি' দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি' কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে

কুসুম !" চমকি রামা উঠিল সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর স্বরবে !

ইহার সহিত Milton-এর Paradise Lost-এর নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা তুলনীয়।—

Now Morn, her rosy steps in the eastern clime
Advancing, sowed the earth with orient pearl,
When Adam waked, so customed ;

* * *

His wonder was to find unawakened Eve.

Then with voice
Mild as when Zephyrus on Flora breathes,
Her hand soft touching, whispered thus: "Awake,
My fairest, my espoused, my latest found,
Heav'n's last best gift, my ever new delight;
Awake, the morning shines, and the fresh field
Calls us; we lose the prime, to mark how spring
Our tender plants, how blows the Citron grove,
What drops the myrrh, and what the balmy reed,
How nature paints her colours, how the bee
Sits on the bloom extracting liquid sweet.

মেঘনাদবধের বহুস্থানেই এইরূপ পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের উৎকৃষ্ট অংশসমূহ সমাহৃত হইয়াছে। কিন্তু গৃহীত বিষয়কে কবি সর্ব্বত্রই নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব দান করিয়াছেন। এই সর্গের মধ্যে Tasso এবং Milton-এর প্রভাব থাকিলেও, কবির বর্ণনার গুণে প্রত্যেকটি চিত্রই মৌলিক চিত্ররূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মাতা ও পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া মেঘনাদ যজ্ঞশালায় যাত্রা করিলেন এবং পতির মঙ্গলের জন্য প্রমীলা ভগবতীর নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—এই বর্ণনায় পঞ্চম সর্গ শেষ হইয়াছে।

পত্নী প্রমীলার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়ে আমরা মেঘনাদের নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়াছি। মেঘনাদবধ কাব্যের সর্ব্বত্রই ইন্দ্রজিতের এই নির্ভীকতা বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিতা, মাতা, পত্নী সকলের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁহার নির্ভীকতা প্রকাশ পাইয়াছে! লঙ্কার বীরগণকে একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও তিনি ভীত বা চঞ্চল হন নাই। জননীর নিকট বিদায় লইবার সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন—

"শিশু ভাই বীরবাহু, বধিয়াছে তারে
পামর ; দেখিব মোরে নিবারে কি বলে ?"

যে রামচন্দ্রকে তিনি সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন, তিনি পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন শুনিয়া তিনি ভীত হন নাই। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন—

... ... হে রক্ষকুল-পতি
শুনেছি মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব, এ মায়া পিতঃ বুঝিতে না পারি।
কিন্তু অনুমতি দেহ সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি ; ঘোর শরানলে
করি' ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি' দিব রাজপদে।

জননীর নিকট বিদায় প্রার্থনাকালে তিনি বলিলেন—

কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি ?
... ...
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে দেবি, তুমি আশীষিলে।

পত্নীর নিকট মেঘনাদের সান্ত্বনাবাক্য, সে আরও নির্ভীকতার পরিচায়ক।

এখনি আসিব,
বিনাশি' রাঘবে রণে, লঙ্কা সুশোভিনী।

কিন্তু মেঘনাদবধে কেবল বাহুবলদৃপ্ত বীর মেঘনাদের চিত্রটিই সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠে নাই। মেঘনাদ স্বদেশবৎসল বীর, পিতৃমাতৃ-ভক্ত, অনুজগণের প্রতি স্নেহবান, গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান্, পত্নীর প্রতি অনুরক্ত, আততায়ীর প্রতিও শিষ্টাচার সম্পন্ন। ট্রোজান বীর Hector-এর আদর্শে মেঘনাদের নির্ভীকতা ও মহাপ্রাণতা পরিকল্পিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ঘটনা 'মেঘনাদের বধ' ষষ্ঠ সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। মায়াদেবী ও বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিলেন অন্যায় যুদ্ধে অধর্ম্ম করিয়া। এই সর্গে কবি মেঘনাদকে উদার নির্ভীক করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু রামকে কাপুরুষরূপে এবং লক্ষ্মণকে কাপুরুষ ও নৃশংসরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

এই সর্গের প্রথমে লক্ষ্মণের হৃদয় উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। মহামায়ার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে নির্ভীকতা বিরাজমান। বীরত্বদৃপ্ত লক্ষ্মণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিয়াছেন—

... ... কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে।

লক্ষ্মণের এই বীরত্বপূর্ণ উক্তির উত্তরে রামচন্দ্রের উক্তি কাপুরুষোচিত হইয়াছে। রামচন্দ্র বলিয়াছেন—

... ... হায় রে কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে—

কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
... ...
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে
এ রাক্ষসপুরে ভাই, আইনু আমরা।

রামের এই কাপুরুষোচিত উত্তরে বিস্মিত হইয়া লক্ষ্মণ বীরোচিত দৃঢ়তা এবং বিনয়ের সহিত রামচন্দ্রকে বুঝাইলেন—

"কি কারণে রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে?"

বিভীষণও রামচন্দ্রকে বুঝাইলেন। কিন্তু রামচন্দ্র তথাপি ভয়ে সংশয়াকুল চিত্ত। তিনি বলিলেন—

নাহি কাজ মিত্রবর সীতায় উদ্ধারি;
ফিরি যাই বনবাসে। দুর্ব্বার সমরে,
দেবদৈত্যনরত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি!
... ...
... কেমনে কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে?

রামচন্দ্র যখন কিছুতেই লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পাঠাইতে রাজি হইতেছিলেন না তখন দৈববাণী হইল—

উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেব-বাক্য, দেবকুল-প্রিয়
তুমি? দেবাদেশ বলি কেন অবহেল?

এইবার রামচন্দ্র সাহস পাইলেন। কিন্তু এই সাহস স্বাভাবিকভাবে রামচন্দ্রের হৃদয়ে উৎসারিত হয় নাই। তিনি দেবানুগৃহীত জানিয়া তাঁহার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইয়াছে।

এই সর্গে মেঘনাদের নির্ভীকতা কবি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে আমরা মেঘনাদকে ধ্যাননিরত দেখিতে পাই। মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে ইষ্টদেবের ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সেখানে মায়াদেবীর প্রভাবে লক্ষ্মণ বিভীষণের সহিত প্রবেশ করিয়া মেঘনাদকে বধ করিতে উদ্যত। ধ্যানভঙ্গ হইলে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে ইষ্টদেব ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রম যখন দূর হইল তখন তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভীত হন নাই এবং ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায়ই মেঘনাদ তখন বলিয়াছিলেন—

> সত্য যদি রামানুজ তুমি ভীমবাহু
> লক্ষ্মণ, সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
> মহাহবে আমি তব। বিরত কি কভু -
> রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ?

পরমুহূর্তে তিনি বলিয়াছেন—

> ... ... আতিথেয় সেবা
> তিষ্ঠি লহ, শূরশ্রেষ্ঠ প্রথমে এ ধামে,
> রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।

এখানে মেঘনাদ কেবল নির্ভীক যোদ্ধা নহেন, তিনি এখানে উদার, শত্রুর প্রতিও শিষ্টাচার-পরায়ণ, অতিথি লক্ষ্মণের সেবা করিতে তিনি সমুৎসুক।

এইভাবে মেঘনাদের চরিত্র এই সর্গে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এখানে মেঘনাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ চমৎকার ফুটিয়াছে। মেঘনাদ জানিতেন যে, পূজার মন্দিরে নিরস্ত্রকে যুদ্ধে আহ্বান করা, অথবা তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। ইহাতে বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় না। তাই তিনি বলিয়াছেন—

> সাজি বীর সাজে আমি ; নিরস্ত্র যে অরি,
> নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে !

এ বিধি, হে বীরবর, নহে অবিদিত
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে কি আর কহিব ?

কিন্তু রাক্ষসবংশোদ্ভূত মেঘনাদ যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, আর্য্য লক্ষ্মণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি মেঘনাদকে নিরস্ত্র অবস্থাতেই হত্যা করিতে উদ্যত। মেঘনাদ ও লক্ষ্মণের – উভয়ের আচরণের তুলনার দ্বারা মধুসূদন মেঘনাদের চরিত্রকে উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। তুলনায় মেঘনাদের চিত্র উদার মহান্ হইয়াছে কিন্তু লক্ষ্মণের চিত্র কাপুরুষতা এবং নৃশংতাদোষে দুষ্ট। ষষ্ঠ সর্গের প্রারম্ভে লক্ষ্মণের যে বীরত্বদৃপ্ত মূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি, তাহা এখানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। লক্ষ্মণ এখানে হীন, তাঁহার আচরণ কাপুরুষোচিত।

মেঘনাদ এই সর্গে বিপদে স্থির বীর নির্ভীক। তাঁহার দেশাত্মবোধ অতুলনীয়, স্বজাত্যভিমান তাঁহার অন্তরে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। খুল্লতাত বিভীষণকে অস্ত্রাগারের দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি বিনীত বচনে তাঁহাকে অস্ত্রাগারের দ্বার ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। খুল্লতাতকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়াছেন—ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার অন্তরে স্বজাত্যভিমান আর দেশাত্মবোধ জাগরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুর্বিনীত ব্যবহার তিনি করেন নাই। যখন তাঁহার সমস্ত অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ হইয়াছে, তখনও তিনি ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে মুষড়াইয়া পড়েন নাই। তখনও তিনি উন্নত মস্তকে, নির্ভীক হৃদয়ে বিভীষণকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে রাঘবপক্ষে যোগ দেওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই। কারণ—

... শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।

মেঘনাদ ধার্ম্মিক—যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান তিনি করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ—শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাঁহার খুল্লতাতের কর্ত্তব্য-বোধ, দেশপ্রীতি জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ বিবিধ গুণে

ভূষিত হইয়া মেঘনাদের চরিত্র এই সর্গে এত উজ্জ্বল হইয়াছে যে তুলনায় লক্ষ্মণের চরিত্র হীন হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশদ্রোহী বিভীষণকেও কবি হীন কুৎসিৎ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন—তাহার চরিত্রের প্রতি স্বদেশবৎসল কবির কোন শ্রদ্ধা ছিল না।

অন্যায় সমরে মেঘনাদের পতন ও বিজয়ী লক্ষ্মণের রামের নিকটে প্রত্যাগমনের পর এই সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে।/

অতি সুন্দর প্রভাতবর্ণনার সহিত মেঘনাদবধ কাব্যের সপ্তম সর্গ আরম্ভ হইয়াছে। মেঘনাদবধকাব্যে মধুসূদন অনেক স্থানেই অতি-সুন্দর প্রকৃতি-বর্ণনা করিয়াছেন। লঙ্কার ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় এবং প্রকৃতি-বর্ণনায় মধুসূদনের কল্পনা ও কবিত্বশক্তির অপরূপ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই।

এই সপ্তম সর্গটি সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-উপন্যাস রচয়িতা রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার Literature of Bengal নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে—"The Seventh Book is in many respects the sublimest in the work, and perhaps the sublimest in the entire range of Bengali Literature"। সত্যই, ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনা-কৌশলে এবং চরিত্রচিত্রণে এই সর্গ অতুলনীয়। কবি অতি কুশলতার সহিত এই সর্গে বীররসের উদ্দীপনও করিয়াছেন। প্রমীলা চরিত্রের বিশেষত্ব—তাঁহার কোমলা মাধুর্য্যময়ী সচকিতা মূর্ত্তিটি এই সর্গে চমৎকার ফুটিয়াছে। তৃতীয় সর্গে আমরা প্রমীলার ভৈরবী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছি। সেখানে তিনি রঘুসৈন্যের সম্মুখীন হইতে ভীতা হন নাই। কিন্তু প্রয়োজনে যে রমণী ভৈরবী রণরঙ্গিনী,—বিপদের পূর্ব্বাভাষ কল্পনা করিয়া সেই রমণীরই কোমলা পল্লবিনী মূর্ত্তিটি প্রকটিত হইয়াছে এই সর্গে। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রমীলার অধীরতা কবি অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

... রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণাল ভুজা ;—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠ মালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠে ! সম্ভাষি' বিস্ময়ে
বসন্ত সৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী
কহিলা ;—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার ? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার-ধ্বনি ?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত ;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ ! না জানি স্বজনি,
হায় লো, না জানি, আজি পড়ি কি বিপদে ?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ ; যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি ! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি।"

মেঘনাদবধ কাব্যের এই একটি মাত্র সর্গে যুদ্ধের দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্য দিয়া, রাবণ ও লক্ষ্মণের কথোপকথনের মধ্য দিয়া এই সর্গে কবি বীররস উদ্দীপন করিয়াছেন। রামায়ণের শক্তিশেল বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া এই সর্গ রচিত হইয়াছে।

রাবণের চরিত্র এই সর্গে চমৎকার ফুটিয়াছে। মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া রাবণ অনুতপ্ত ও ব্যথিত হইয়া মুষড়াইয়া পড়েন নাই। আশা, উন্মাদনায় রাবণ এই সর্গে উৎসাহিত। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণের যে করুণ বিলাপ আমরা শুনিয়াছি, সেইরূপ করুণ বিলাপ রাবণ এখানে করেন নাই। প্রথম সর্গে রাবণ পুত্রশোকে কাতর, অনুতপ্ত—মনস্তাপে উন্মাদপ্রায়। কিন্তু সপ্তম

সর্গে বীরাগ্রগণ্য মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াও তিনি কাতর নহেন। বীরত্বের মহিমায় তিনি মহিমান্বিত।

ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের চরিত্রে কাপুরুষতা দোষ স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু এই সর্গে লক্ষ্মণের অতুলনীয় বিক্রম তাঁহার চরিত্রকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। রাবণের সহিত লক্ষ্মণের যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হইলে পর রাবণ যে আস্ফালন বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ তাহাতে ভীত বা বিচলিত না হইয়া উত্তর দিয়াছেন।—

ক্ষত্রকুলে জন্ম মম রক্ষঃকুলপতি
নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব
তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি ;
যথা সাধ্য কর, রথি ; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা, পুত্রবর যথা।

লক্ষ্মণ এখানে নির্ভীক, উদ্বেগশূন্য এবং আত্মবাহুবলবিশ্বাসী। তথাপি ইষ্টদেবের প্রসাদলাভে নবীন আশায় আশ্বস্ত হইয়া রাবণ দক্ষতার সহিত যুঝিলেন। যুদ্ধে তিনি লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে আহত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সর্গে লক্ষ্মণের নির্ভীকতা ও বীরত্ব বেশ ভালরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাম এই সর্গে ভীরু ও কাপুরুষরূপে চিত্রিত। কবি যেখানে রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত রঘুপতি রামের সাক্ষাৎকার ঘটাইয়াছেন, সেখানে রাবণ ব্যঙ্গ ও দম্ভ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

... ... না চাহি তোমারে
আজি হে বৈদেহীনাথ, এ ভবমণ্ডলে
আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপট সমরী
পামর ? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে রাঘব-শ্রেষ্ঠ।

রাবণ এইভাবে লক্ষ্মণকে বধ করিবার সঙ্কল্প রামচন্দ্রের সম্মুখে প্রকাশ করা সত্ত্বেও রামচন্দ্র তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই, বা রাবণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন নাই। প্রাণাধিক ভ্রাতার সহিত রাবণকে যুদ্ধ করিতে না দিয়া তিনি স্বয়ং এক্ষেত্রে রাবণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে সমীচীন হইত। এই সকল কারণে মধুসূদনের রামচরিত্র হীন হইয়া পড়িয়াছে। মেঘনাদবধের রামের মধ্যে আমরা কোমলতা, বিনয় প্রভৃতি দেখিতে পাই। রামের করুণ-কোমল মূর্ত্তিটি পরিস্ফুটনে মধুসূদন বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কোমলতার সহিত দৃঢ়তা, নির্ভীকতা এবং বজ্রাদপি কঠোরতার যে সামঞ্জস্যের মধ্যে রামায়ণের রামচরিত্রের বিশেষত্ব তাহা মেঘনাদবধে ব্যর্থ হইয়াছে। রামায়ণ-বর্ণিত রামচন্দ্রের রুদ্রতেজ আমরা মেঘনাদবধের রামে পাই নাই। মেঘনাদবধের রাম বীরাঙ্গনা প্রমীলার বীরত্বে ভয়ব্যাকুল, লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পাঠাইবার সময়ে রোদনপরায়ণ এবং প্রাণপ্রিয় ভ্রাতার প্রাণনাশে উদ্যত শত্রু রাবণকে রণক্ষেত্রে সম্মুখে পাইয়াও তাঁহার সহিত যুদ্ধে বিমুখ। বীরাগ্রগণ্য রামের চরিত্র এইরূপভাবে চিত্রিত করায় মধুসূদন প্রচলিত সংস্কার ও আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

অষ্টম সর্গে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জীবন-লাভ বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণের মূল ঘটনা বজায় রাখিয়া কবি ইহাতে ইনিড্ ও ডিভাইন কমেডির অনুসরণ করিয়াছেন। ভার্জিল, দান্তে, মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদিগের অনুসরণ করিয়া এই সর্গে মধুসূদন স্বর্গ ও নরকের চিত্র আঁকিয়াছেন,—তবে কবি নরক অপেক্ষা স্বর্গের চিত্রাঙ্কণেই অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। মেঘনাদবধের নরকে বীভৎস রসেরই প্রাধান্য—ডিভাইন কমেডির নরক-বর্ণনার ন্যায় মধুসূদনের নরক-বর্ণনা আমাদিগকে ভীত ও স্তম্ভিত করে না।

এই সর্গে লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ কারুণ্যের অশ্রু-নির্ঝর।

মেঘনাদবধ কাব্যের আদি মধ্য ও অন্তের—সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণ রাগিণী বাজিয়াছে। নবম সর্গেও করুণ রসের প্রাধান্য। প্রথম সর্গে রাবণের বিলাপ, চিত্রাঙ্গদার বিলাপের মধ্য দিয়া যে করুণ রস উৎসারিত হইয়াছিল, নবম সর্গে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। বর্ণনা-গুণে এই অংশ সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট। এখানে প্রমীলার অতি করুণ, বিষাদময়ী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। রাবণের করুণ মূর্ত্তি এবং বিলাপও আমাদিগের মর্ম্ম স্পর্শ করে। এই সর্গে প্রমীলার চরিত্র সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রমীলার চিতারোহণের ন্যায় গম্ভীর ও করুণ ভাবোদ্দীপক চিত্র বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

মেঘনাদবধ কাব্য করুণরস প্রধান। ইহার প্রথমেই কবি যদিও বলিয়াছেন—"গাইব মা বীররসে ভাসি' মহাগীত'—তথাপি ইহার আদ্যোপান্তই করুণরস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে বীররস উৎসারিত হইয়াছে মাত্র। এ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং একখানি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত হইল—

"I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow! I won't trouble my readers with Vira Ras (বীররস)।"

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের টীকাকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এই কাব্যখানির মধ্যে করুণ রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—

যদিও ইহাতে বীররসের স্থায়িভাব, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ও আলম্বন বিভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তথাপি করুণরসই ইহার আদ্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং এই স্থায়িভাব শোকই অধিক প্রকটভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কবির পরদুঃখকাতরতা এবং সহৃদয়তাই ইহার মূল। ক্রৌঞ্চ-বধূর কাতর ক্রন্দনে বিষাদের কবি মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয়বীণা সেই যে কাঁদিয়া উঠিল দেব-যক্ষ রক্ষোনর সংগ্রামের বিশ্ববধিরকারী রুদ্রনাদ তাঁহার করুণরাগিণীকে

অতিক্রম করিতে পারিল না। মহর্ষির পদাঙ্কানুসরণকারী কবি মধুসূদনের হৃদয়বীণাও তেমনি ভগ্নহৃদয় রাক্ষসরাজ এবং পুত্রশোকাতুরা গন্ধর্ব্বনন্দিনীর কাতর ক্রন্দনে এমন কাঁদিয়া উঠিল যে, কবি 'বীররসে' ভাসিয়া 'মহাগীত' গাহিবার সঙ্কল্প করিয়াও কাব্যখানির আদ্যোপান্ত করুণরসের প্লাবনেই ভাসাইয়া দিলেন।

কাব্যের প্রথমে যে করুণরস উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, শেষ সর্গে সেই করুণতা উদ্বেল হইয়া উঠিয়া রাবণকে অশ্রুসিক্ত করিয়াছে, সমগ্র লঙ্কাবাসীকে অশ্রুনীরে অভিষিক্ত করিয়াছে। প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদা পুত্রশোকে করুণ বিলাপ করিয়াছেন। এই সর্গ রাবণের করুণ বিলাপেও পূর্ণ। লঙ্কার প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া তিনি সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া করুণ মিনতি জানাইয়া বলিয়াছেন—

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ, হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমায়?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি, প্রভঞ্জন সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি! বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,

দূর কর অপবাদ, জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি!

পুত্র মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষেক করিবার কালেও রাবণের হৃদয়ের করুণ উচ্ছ্বাস উৎসারিত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণরস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পরাজয়ের কারুণ্যই মেঘনাদবধ কাব্যের সৌন্দর্য্যসাধন করিয়াছে। রাবণের করুণ বিলাপে কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে এবং নবম সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার সহমরণ ও রাবণের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের সহিত কাব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। রাবণ ধীরে ধীরে তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূর চিতার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন—

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল। কেমনে ফিরিব,—

হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে !
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?

শেষ সর্গে রাবণের এইরূপ মর্ম্মভেদী বিলাপ সমস্ত কাব্যখানিকে বিয়োগান্ত কাব্যের মহিমা দান করিয়াছে। Milton-এর Paradise Lost-এর ন্যায় মেঘনাদবধ কাব্যখানি শোকান্ত মহাকাব্য—"Meghnadvadha like Milton's Paradise Lost is a tragedy turned into an epic."

মধুসূদনের মেঘনাদবধে একটা সুগ্রথিত কল্পনা ও কবিত্বস্রোত অবাধে বহিয়া গিয়াছে। ইহার রচনা আড়ম্বরময়, শব্দসম্পদ অতুলনীয় এবং গম্ভীর। ইহা বাক্যালঙ্কারে ভূষিত—কবির উপমাপ্রয়োগ-নৈপুণ্য বিস্ময়কর। মেঘনাদবধের বাক্যবিন্যাসে চমৎকারিত্ব আছে এবং এই সকলের সহিত অমিত্রছন্দের স্বাধীনতা ও মধুরতা সংযুক্ত হইয়া কাব্যখানি বিশেষ মনোহারী হইয়াছে। এই কাব্য রসানুযায়ী শব্দ-প্রয়োগে এবং স্বাভাবিক বাক্যবিন্যাসে সজীবতাময় ; ভাবানুযায়ী ছেদ পড়ায় ছন্দ স্বাভাবিক ও সঙ্গীতধ্বনিময় এবং সংযত অনুপ্রাসে উহা সুমিষ্ট ও মনোহর।

কিন্তু মেঘনাদবধে দোষ-ত্রুটিও আছে। কবি মধুসূদন গ্রীক কবি হোমারের অনুসরণ করিয়া প্রধান দেবদেবীর চরিত্রগুলিকে

নিতান্ত হীন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার কাব্যের হরপার্ব্বতী কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের হরপার্ব্বতী অপেক্ষা হীন। রামচরিত্র তাঁহার কাব্যে তেমন ফুটে নাই, লক্ষ্মণও ভীরু কাপুরুষরূপে চিত্রিত। স্থানে স্থানে লক্ষ্মণের বীরত্বদৃপ্ত মূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে মাত্র! মধুসূদনের রাম অথবা রাবণ অপেক্ষা হেমচন্দ্রের ইন্দ্র ও বৃত্র উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি। বৃত্রসংহারে চিত্রিত চরিত্রগুলি ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন। বৃত্রসংহারের দেবতাগণ মেঘনাদবধ কাব্যের দেবতাদিগের মত দেবত্বহীন হন নাই। অথচ, হেমচন্দ্র অসুরদের প্রতি কোনরূপ তাচ্ছিল্যও প্রদর্শন করেন নাই। দৈত্যরাজ বৃত্র রাক্ষসরাজ রাবণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মধুসূদনের কাব্যের ছন্দেও মাঝে মাঝে ত্রুটি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু কবি তাঁহার কাব্যের এই সকল দোষ সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন—

'I find that there are many metrical blemishes in the earlier books of Meghnada. * * I am sure the poem has many faults. What human production has not?

দোষ-ত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন, 'মেঘনাদবধ কাব্য'খানি বঙ্গ-সাহিত্যের মুকুটমণি। ইহা বঙ্গসাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে এক যুগান্তরের সূচনা হইয়াছিল। আধুনিক কাব্য রচনার একটা সুস্পষ্ট আদর্শ 'মেঘনাদবধ কাব্য'খানি বঙ্গসাহিত্যে তুলিয়া ধরিয়াছিল। এই কাব্যখানি রচনা করিয়া বঙ্গভাষার শক্তি ও সামর্থ্যকে কবি যেন সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন। অতঃপর সকলে মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, যে ভাষায় কেবলমাত্র নির্ঝরিণীর কুলুকুলু নিনাদ অভিব্যক্ত হইত, সেই বঙ্গভাষায় জল-প্রপাতের ভীষণ গর্জ্জন আসে কোথা হইতে—মধুর বেণুবীণানিক্কণ প্রকাশক্ষম ভাষায় ঘনঘোর ভেরী-নিনাদ উত্থিত হয় কেমন করিয়া! কোমল নবীন লতিকার ন্যায় ক্ষীণকায়া বাংলাভাষার অভ্যন্তরে যে

অসামান্য শক্তি ও তেজস্বিতা বর্ত্তমান থাকিতে পারে মধুসূদনের পূর্ব্বে এই ধারণা সকলের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। ভারতচন্দ্র বাংলা কবিতাকে যে পথে পরিচালিত করেন, ঈশ্বরচন্দ্র যে পথের গৌরব-বর্দ্ধনে যত্নবান হন, মধুসূদনের অলৌকিক প্রতিভা ও সৃজনীশক্তিবলে সেই পথ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বাংলার কাব্যসাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদন অসাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে যেন এক নবযুগের সূচনা হইয়াছিল। এতদিন বাংলা কাব্যসাহিত্য যেন একটা লক্ষ্যের অভাবে অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্যপথে যাত্রা করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যসাহিত্যে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হইল—নূতন ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব হইল। বাংলা কাব্যসাহিত্য একটা নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া ক্রমশ উন্নতির পথে পরিচালিত হইতে লাগিল।

মেঘনাদবধ কাব্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের মত মেঘনাদবধ কাব্যও আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কিন্তু তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে শিথিলতা লক্ষিত হয়! কবি স্বয়ং এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি একখানি পত্রে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghnad.

সত্যই মেঘনাদবধ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনেকাংশে পরিণত ও সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দে যে সঙ্গীত ও মাধুর্য্য রহিয়াছে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সেই সঙ্গীত ও মাধুর্য্যের একান্ত অভাব। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবাহ মধ্যে মধ্যে ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটা স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ গতিশীল —মেঘনাদবধের ছন্দে একটা সরলোজ্জ্বল ওজস্বী প্রবাহ আছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' সেই সরল স্বচ্ছন্দ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয় না।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের যাহা কিছু সৌন্দর্য্য তাহার সন্ধান মধুসূদন অবশ্য প্রধানতঃ মিল্‌টন হইতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু মিল্‌টন ইংরেজি সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি ইহার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। আর মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিত্রছন্দের প্রবর্ত্তক, এবং তিনিই ইহার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই হিসাবে মধুসূদনকে মিল্‌টন্ অপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিব না কি?

মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি এই ছন্দে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই এই ছন্দ ব্যবহারে মধুসূদনের

মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের কাব্যের ছন্দসৌষ্ঠব অথবা ছন্দ-প্রবাহ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অমিত্রাক্ষর ছন্দ অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। মধুসূদন ইংরেজি Blank Verse-এর অনুসরণ করিয়া ছন্দে যে অবাধ প্রবাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ করায় সেই প্রবাহ রুদ্ধ ও ব্যাহত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিলহীন পয়ার, উহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে অনুপ্রাস ও ছন্দস্পন্দন তাহা নাই। তাঁহার ছন্দ কেবল উন্মাদনাপূর্ণ সরল গদ্যেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি ও মাধুর্য্য মধুসূদন যতখানি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র মধুসূদনের পরে কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি ও মাধুর্য্য ঠিক ততখানি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। নবীনচন্দ্রের ছন্দ মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব ওজস্বিতাসম্পন্ন বটে। কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। তাই বলিতে হয় যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা এবং চরম উৎকর্ষসাধক হিসাবে মধুসূদন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আজিও এককভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার এই যশ অপর কোনও পরবর্ত্তী কবি পরিম্লান করিতে পারেন নাই।

একমাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দকে আশ্রয় করিয়া মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধে বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া যে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে সেইরূপ দৃষ্টান্ত আর লক্ষিত হয় না। গীতিকবিতা রচনা করিবার জন্য বহু ছন্দের প্রয়োজন। তাই গীতিকবি তাঁহার অন্তরস্থিত ভাবটিকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভাবের অনুরূপ বাহন বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। গীতি-কবির প্রত্যেক কবিতার রূপ স্বতন্ত্র, ছন্দ স্বতন্ত্র। তাঁহাদের প্রত্যেক রকমের ভাব ও রূপের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বিশেষ বিশেষ ছন্দে। প্রত্যেক সন্ধ্যা গীতিকবির নিকটে নব নব রূপে প্রতিভাত হয়। প্রতিটি সন্ধ্যা গীতিকবির কবিতায় বিভিন্ন ছন্দবৈচিত্র্যে প্রকাশ পাইয়া

থাকে। Blank Verse আর গীতিকবিতার ছন্দে পার্থক্য এইখানে। বিভিন্ন রং রূপ ও ভাব প্রকাশ করিতে হইলে গীতিকবির নিকট বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু গুরুগম্ভীর বীরত্বপূর্ণ ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া, মধুর বেণুবীণানিক্কণ পর্য্যন্ত সকল প্রকার ভাবই এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের আধারে অভিব্যক্ত হইতে পারে। তাই দেখি মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দের ভিতর দিয়া বাঁশীর মৃদুমধুর গুঞ্জরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভেরীর সুগম্ভীর আওয়াজ পর্য্যন্ত সবই প্রকাশ পাইয়াছে —একই প্রবাহে ও আধারে বিভিন্ন রং রূপ ও ছায়া প্রতিভাত হইয়াছে। মেঘনাদবধের করুণ ও বীরত্বব্যঞ্জক অংশসমূহ সমানভাবে আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করিয়া থাকে।

মিল্‌টন সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন—

His style is bold and at times sweetly lyric.

একথা মিল্‌টনের কাব্যের অনুরাগী ও মিল্‌টনের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাহায্যে বীর ও করুণ রস পরিবেশন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়াই বোধ হয় মধুসূদন এই ছন্দকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য'খানি রচনা করিয়াছিলেন।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করার আরও একটি প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয়। কবির উদ্দেশ্য যেখানে কাহিনী বর্ণনা, সেখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দই বিশেষ উপযোগী। মধুসূদনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাহিনী বর্ণনার জন্য বাঙ্গালী কবিগণ পয়ারাদি ছন্দই আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সেই রীতিই অনুসৃত হইয়া আসিয়াছিল। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র অপূর্ব্ব ছন্দশিল্পী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও ঐ মিত্রাক্ষরের গণ্ডীর মধ্যে ভাবকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল। বাংলা কাব্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভেও রঙ্গলাল তাঁহার সকল কাহিনী-কাব্য পয়ারে রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইহাতে ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ্ ব্যাহত হইত। রঙ্গলাল অবশ্য তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র এক স্থানে চতুর্দ্দশাক্ষর পয়ার ছন্দকে প্রসারিত করিয়া অষ্টাদশ অক্ষর সমন্বিত পয়ার ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যে অষ্টাদশ অক্ষরের পয়ার ছন্দের ব্যবহার সেই প্রথম। ভাব অনুযায়ী পংক্তিকে প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা রঙ্গলাল উপলব্ধি করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবাহে ভাবকে যেরূপ ইচ্ছামত প্রবাহিত করাইয়া লইয়া যাওয়া যায় অষ্টাদশ অক্ষরের পয়ারে তাহা সম্ভব নহে।

কিন্তু মধুসূদন দেখিলেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের দ্বারা ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ অব্যাহত থাকে। কারণ, অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাব এক পংক্তি হইতে অপর একটি পংক্তিতে প্রবাহিত হইয়া চলে। পয়ারাদি ছন্দে কবির ভাব গণ্ডীর মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। চতুর্দ্দশাক্ষর মিত্র পয়ার ছন্দের লক্ষণ এই যে, ইহাতে শ্লোকের চরণদ্বয়ের প্রত্যেক অষ্টম অক্ষরে স্বল্প বিরাম থাকে এবং দুই চরণে অন্ত্যানুপ্রাস বা শেষ অক্ষরে মিল রাখিতে হয়। অধিকন্তু, কোথাও কোথাও এক চরণের এবং প্রায়ই দুই চরণের মধ্যেই ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু অমিত্রছন্দের সর্ব্বত্র চতুর্দ্দশ অক্ষরের বৃত্তি থাকিলেও, ইহাতে চরণসমূহের অন্ত্যানুপ্রাস থাকে না, এবং ভাব কোন বিরাম বা যতির অনুগত হইয়া চলে না। ভাবের অনুবর্ত্তী যতি প্রয়োজন মত চরণের যে কোনো স্থলে থাকিতে পারে। দুই হইতে বারো অক্ষরের পরে, যেখানে আবশ্যক ভাবানুযায়ী যতি থাকিতে পারে। ভাবের পরিসমাপ্তি লাইনের শেষে বা মধ্যে বা আদিতে যেখানে খুশী হইতে পারে, এবং যেখানে ভাবের সমাপ্তি হয়, সেইখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। চরণান্তে ছেদ যত কম হয়, ছন্দ তত সুন্দর ও শক্তিশালী হয়। চরণান্ত যতি এড়াইয়া বাক্যকে এক চরণ হইতে অপর চরণে যত গড়াইয়া

প্রবাহিত করিয়া লইতে পারা যায়, ছন্দ ও ভাব তত বিচিত্র হইয়া থাকে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবকে যতদূর ইচ্ছা হৃদয়াবেগের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অগ্রসর করা যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৌন্দর্য্যই এইখানে। ইহাতে মাধুর্য্য বা মেলডি এবং পদগতির তাল বা Rythm সংমিশ্রিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাব যতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলে না, বরং যতিই ভাব অনুযায়ী চলিয়া থাকে। তাই ইহা আকাশ ও সমুদ্রের ন্যায় স্বচ্ছন্দ বিহারের ভূমি, কবির ভাব-প্রকাশের অনন্ত সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে অর্থের ও ভাবের সহিত বাক্য সম্মিলিত হইয়া একটি স্বচ্ছন্দ প্রবহমান ধারাগতি লাভ করে। এই ছন্দ ভাবের উত্তাল স্বাধীন স্রোতে ভাষাকে লইয়া চলে। ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহই অমিত্রছন্দের প্রাণ। গ্রীসের মহাকবি হোমার, ইতালীর ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো এবং ইংলণ্ডের কবি মিল্‌টনের ছন্দের মধ্যে এই শক্তিটুকু লক্ষ্য করিয়া এবং মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে এই নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং মধুসূদনই প্রথম বাঙ্গালী যিনি শব্দের যাবতীয় বাহ্য মিলকে অগ্রাহ্য করিয়া বিরামের বৈচিত্র্যের ও অনুপ্রাসের যমকের ধ্বনিলালিত্যের উপরে নির্ভর করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ মহাকাব্য মেঘনাদবধ একই ছন্দে আগাগোড়া রচনা করিয়াও শ্রুতিসুখকর করিতে পারিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন মধুসূদন আবার প্রায়ই তাহার কাব্যের প্রতি চরণের অষ্টম অক্ষর দীর্ঘ করিয়া ছন্দের মাধুর্য্য বা মেলডি বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই একখানি চিঠিতে বলিয়াছিলেন—

"The melody of a line is improved when the 8th syllable is made long."

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র যতি অনির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ভাব কখনও দ্রুতগতিতে, কখনও বা স্খলিত গতিতে, আবার কখনও বা

একেবারে স্থগিত হইয়া দাঁড়াইয়া পাঠকের মনে বিচিত্রতার বিস্ময় উৎপাদন করে। মধুসূদন অসামান্য ধ্বনিজ্ঞান ও তাল লয়ের কান লইয়া এই ছন্দ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি এত সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ছন্দসৃষ্টিতে তিনি মিল্টনের সমধর্ম্মী অপরাজেয় কবি।

সংস্কৃত ছন্দের গাম্ভীর্য্য লঘু গুরু উচ্চারণের উপর ও মাত্রাধ্বনির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাংলা ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ প্রায় একরকমের হওয়াতে তাহা এতদিন উচ্চারণ ও মাত্রাগত ধ্বনি-তারতম্যের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য করে নাই, কেবল চরণের মধ্য-যতি ও অন্ত্য-মিলের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের সচেতন কবিপ্রতিভা বঙ্গভাষার এই ধ্বনিগত শক্তির দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। স্বাধীনভাবে যতিচিহ্নের যথেচ্ছ প্রয়োগ এবং হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ যথাস্থানে বিনিয়োগ, এই দুইয়ের মধ্যেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি নিহিত। এইখানেই মধুসূদনের কাব্যে সংস্কৃত শব্দের ও যুক্তাক্ষরবহুল শব্দ ব্যবহারের রহস্য নিহিত আছে। মধুসূদন এই সব গুণে অতুলনীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছন্দকুশল কবি।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে। ইহার কারণ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া কবি তাঁহার কাব্যখানির ছন্দকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছেন—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ছন্দের যে বৈচিত্র্যহীনতা ছিল তাহা পরিহার করিয়া তিনি ছন্দকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছেন। ছন্দকে হৃদয়-ভাবের অনুগত গতি দিয়া মধুর করিয়াছেন। মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কবিদিগের ছন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কবিগণ ছন্দকে হৃদয়-ভাবের অনুগত গতি না দিয়া, কেবলমাত্র অক্ষর সংখ্যা অথবা চরণান্ত মিলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছন্দসৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে প্রাক্ মধুসূদনীয় যুগের ছন্দ একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। সকল প্রাচীন

বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যেই এই দৃষ্টান্ত আছে। এইজন্য সেই সকল কবিরা পর্য্যায়ক্রমে পয়ার ও ত্রিপদীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র ছন্দের একঘেয়ে দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত বহু সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অমিত প্রতিভাশালী মধুসূদন বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই বাংলা ছন্দের অভাবটুকু অনুভব করিতে পারিলেন, এবং ইউরোপীয় কবিদের রচনায় অমিত্রছন্দের শক্তি দেখিয়া প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে কাব্যের ছন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষরের বাহ্যিক মিলের মধ্যে নহে, উহার মূল কবির হৃদয়ে। ছন্দ সুললিত করিতে হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করিতে পারাই কবির প্রধান কৌশল। কবির এই কুশলতা মেঘনাদবধ কাব্যের আদ্যোপান্তে সুপরিস্ফুট। বাংলা ছন্দকে ধ্বনিমাধুর্য্যে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিবার মানসেই তিনি বাছিয়া বাছিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহার কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, —'যাদঃপতিরোধযথা চলোর্ম্মি আঘাতে' প্রভৃতি পংক্তিতে শব্দসমূহের ধ্বনি আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু মধুসূদনের প্রবর্ত্তিত নূতন ছন্দের মাধুর্য্য ও শক্তি ধরিতে না পারিয়া তাঁহার সমসাময়িক কোনো কোনো সমালোচক তাঁহার ছন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে এই ছন্দের অনুকূলে তাঁহার মত দিতে পারেন নাই। পরে অবশ্য তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি তখন এই ছন্দের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ঢাকা জেলার পানকুণ্ড গ্রাম নিবাসী জগদ্বন্ধু ভদ্র নামক এক ব্যক্তি ১২৭৫ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখের বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকায় 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নামে মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দের একটি হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশ করেন। কিন্তু ইঁহাদের এই সকল নিন্দা

এখন বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। মধুসূদনের সৃষ্টি অবিনশ্বর হইয়া আছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র লালিত্য ও মাধুর্য্য আজিও এতটুকু পরিম্লান হয় নাই।

মধুসূদনের কাব্যের প্যারডি দেখিয়া এবং মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের মৌলিকতা দেখিয়া সর্ব্বজনপূজ্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন—

'ঐ একটা অদ্ভুত জিনিয়াস তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত কাব্য তোদের বাংলা ভাষাতে ত নাই-ই, ভারতবর্ষেও এমন একখানা কাব্য ইদানীং দুর্লভ। কিন্তু তোদের দেশে কেউ একটা নূতন কিছু করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস। বলি, আগে ভাল করে দেখ্না, লোকটা কি বলছে। তা না, যাই কিছু আগেকার মত না হলো, তখনি লোক তার পিছু লাগলো। এই মেঘনাদবধ কাব্য, যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্ত করতে কি না 'ছুঁচোবধ কাব্য' লেখা হোল। তা যত পারিস লেখ্ না, তাতে কি। সেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' এখনো হিমাচলের মত আকাশ ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার খুঁত ধরতে যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব critics-দের মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে। মাইকেল যে নূতন ছন্দে, যে ওজস্বিনী ভাষায় কাব্য লিখে গেছেন তা সাধারণে কি বুঝ্বে!'

মধুসূদন যখন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তখন বাঙ্গালী পাঠকগণ ঐ ছন্দের সহিত পরিচিত ছিলেন না। পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে সেই সবেমাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ বঙ্গসাহিত্যে আমদানী হইয়াছে। তাই অনেকেই এই ছন্দের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মধুসূদনের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়াছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণ উহার স্বচ্ছন্দ সাবলীল প্রবাহ ও ধ্বনির মধ্যে। ছন্দকে গতিবেগ দিবার জন্য, ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই মধুসূদন সংস্কৃতমিশ্রিত বাংলা ভাষার ব্যবহার করিয়া তাঁহার অমর কাব্য মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন যিনি কয়িয়াছিলেন তিনি যে কতবড় প্রতিভাবান কবি ছিলেন এবং এই ছন্দের ঝঙ্কার তাঁহার কবিত্বশক্তির কতখানি পরিচয় দিতেছে, তাহা বুঝিতে গেলে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গীত আয়ত্ত করিতে কতখানি শক্তির প্রয়োজন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিদেশী ভাষার উৎকৃষ্টতম ও সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ছন্দ। সেই ছন্দকে তদানীন্তন অতি দুর্ব্বল ও অপরিণত বাংলা কাব্যের দেহে ধ্বনিত করিয়া তোলা যে কতখানি বিস্ময়কর ব্যাপার তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। মধুসূদন অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে বিদেশী কাব্যের আত্মাকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ সঙ্গীতধ্বনিময়, জীবন্ত ও গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ মধুসূদনের উদ্ভাবিত এই নূতন ছন্দ বাংলা কাব্যের রীতি প্রকৃতি এমন কি গতিও বদলাইয়া দিল। যে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি এই নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রেরণাবশেই তিনি এক নূতন ধরণের কল্পনা ও ভাবজগতের প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন। এই ছন্দ শুধু বাংলা কবিতার বেড়ি ভাঙ্গে নাই, সঙ্গে সঙ্গে নূতন পথের সন্ধান আনিয়াছে। পয়ারপ্লাবিত এই দেশের কবিদের মধ্যে এই ছন্দ নূতন সৃষ্টির দুঃসাহস আনিয়া দিল, পয়ার রচনায় অভ্যস্থ কবিদিগের মধ্যে স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি সঞ্চার করিল।

সুতরাং দেখা গেল যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবন করিয়া, ইহার সার্থক সুন্দর রূপ ফুটাইয়া তুলিয়া মধুসূদন কেবল কবিতার বহিরঙ্গ ভাষা ও ছন্দের সংস্কার করেন নাই; তাঁহার উদ্ভাবিত ছন্দের ধ্বনি-মাধুর্য্য ও ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য ভাবজগতেও একটা নূতনত্বের সন্ধান দিয়াছিল, উত্তরকালের বাংলার কবিদিগের কবিকল্পনা ও কাব্যপ্রেরণাকেও সঞ্জীবিত করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালের কবিগণ মধুসূদনের সার্থক

সৃষ্টি দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে ক্ষমতা থাকিলে বিদেশী কাব্যের উৎকৃষ্টতম ও কঠিনতম ছন্দকে যেমন বাংলা সাহিত্যে আমদানী করা যায়, তেমনি বিদেশী কাব্যের ভাবসম্পদও বাংলা কাব্যের শ্রীসম্পাদন করিতে পারে।

সর্ব্বশেষে বলিতে হয় যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবনের দ্বারা মধুসূদন পয়ারের অন্তর্নিহিত শক্তি যে কত বৃহৎ তাহা প্রথম দেখাইলেন। অতঃপর পয়ারের শক্তি বহুপরিমাণে বাড়িয়া গেল; অসামান্য ধ্বনি-বৈচিত্র্যে বাংলা কাব্যের আদিরূপ যে পয়ার তাহা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য ও মেঘনাদবধ

মহাকাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যের বহুকাল-প্রচলিত প্রথা নহে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনা আরম্ভ হয়। বঙ্গসাহিত্যে কবি-প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে গীতি কাব্যে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

গীতিকবিতাই বঙ্গসাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মত, যেমন তাহার ভাবের সৌরভ, তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য্য। রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য্য।

গীতিকাব্যের প্রতি বাঙ্গালীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও কেন ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙ্গালী কবিগণ মহাকাব্য রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের সময়েই বাঙ্গালী জনসাধারণ সেক্‌সপীয়ার মিল্‌টন প্রভৃতি ইংরেজ কবিদিগের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য অনুশীলনের ফলে বাঙ্গালীর নিকট তখন নূতন সৌন্দর্য্যের জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালী তখনও শেলী, কীট্‌স প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদিগের সহিত সম্যক পরিচয় লাভ করে নাই। তখনও বঙ্গসাহিত্যে অষ্টাদশ শতকের পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবল প্রভাব। অষ্টাদশ শতকের পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ ক্লাসিক। সেই আদর্শে দীক্ষিত হইয়া বাঙ্গালী কবিগণ মহাকাব্য রচনাকেই শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের কল্পনাদর্শ ভাবমাধুর্য্য ও বর্ণনার সৌন্দর্য্য বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়াছিল—সুতরাং যাঁহাদের মধ্যে কবিপ্রতিভা ছিল তাঁহারা মহাকাব্য রচনাতেই মনোনিবেশ করিলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে

আবির্ভূত কবিদিগের ধারণাই ছিল যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য হইতেছে মহাকাব্য এবং একমাত্র মহাকাব্য রচনাতেই কবিপ্রতিভা সম্যক প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, আখ্যানমূলক কাহিনী রচনার জন্য বাংলা গদ্য বা উপন্যাস সাহিত্য তখনও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে নাই। অথচ সাহিত্যিকমাত্রেরই প্রাণ মন তখন নূতন নূতন আদর্শে, ভাবে ও দীর্ঘ কাহিনীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে সেকালের সাহিত্যিকগণ দেখিলেন যে, একমাত্র মহাকাব্যের সাহায্যেই যে কোনও একটি বৃহৎ কাহিনীকে প্রকাশ করা সম্ভব। এই সকল কারণে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের কবিগণ মহাকাব্য রচনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতকে যে কয়টি বাংলা মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলি পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শে রচিত। মেঘনাদবধেও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। কারণ, সে যুগে পাশ্চাত্য কাব্যরসের প্রতিই সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য কাব্যরসপিপাসু পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্য—পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভিতর যে ধরণের কল্পনাভঙ্গী ও কলানৈপুণ্য ছিল তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই সে যুগের কবিগণ বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্রোত প্রবাহিত করাইবার জন্য প্রথম অবতীর্ণ হন রঙ্গলাল। মধুসূদনের পূর্ব্বে রঙ্গলাল তাঁহার পদ্মিনী উপাখ্যান রচনা করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সম্পদ পদ্মিনী উপাখ্যানের স্থানে স্থানে সমাহৃত হইয়াছে। তবে ইহা মহাকাব্য নহে। পদ্মিনী উপাখ্যানে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব এবং ভারতচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিষয়-বস্তুতে উহা অবশ্য স্কট্ এবং বায়রণের Metrical Romance-এর শ্রেণীর। রঙ্গলালের উদ্দেশ্য ছিল বায়রণ, স্কট্ এবং মুরের Verse Tale বা কাহিনীকাব্যের অনুকরণ। কিন্তু Verse Tale-এর ভিতরে যে ধরণের কবিদৃষ্টি ও কল্পনা-নৈপুণ্য বর্ত্তমান

তাহা তিনি তাঁহার উপাখ্যান-কাব্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। তবে পাশ্চাত্য প্রভাবে রঙ্গলালের অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগিয়াছিল এবং সেই দেশাত্মবোধ তাঁহার রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র মধ্য দিয়া উৎসারিত হইয়াছে। ইহাই 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র প্রধান বিশেষত্ব —এবং বিষয়-গৌরবে কাব্যখানি বঙ্গসাহিত্যে একটি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে।

রঙ্গলালের অনুকরণে মধুসূদনেরও উপাখ্যান-কাব্য লেখাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি মহাকাব্য রচনা করিলেন। মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার মূলে কয়েকটি কারণ ছিল। মধুসূদনের অন্তর্জীবনে ও কবিকল্পনায় রোমান্টিক কাব্যের লক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইংরেজ কবি মিল্‌টন ও গ্রীক কবি হোমারের মহাকাব্যের ছন্দের ধ্বনি ও কল্পনার বিশালতা তাঁহার কবি-চিত্তকে কাব্যসৃষ্টিতে যেরূপ উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল, ভাবপ্রধান গীতিকবিতা তাঁহাকে সেরূপ মুগ্ধ করিতে পারে নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনও মধুসূদনকে মহাকাব্য রচনারই প্রেরণা জোগাইয়াছিল। পদ্মাবতী নাটকে তিনি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার মহাকাব্য রচনার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। গতিশীল ভাষা ও ছন্দ মহাকাব্যের বিশেষ উপযোগী। নাটকের জন্য তিনি ঐরূপ ছন্দের প্রবর্ত্তন ও ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই নব-আস্বাদিত ছন্দে তিনি মহাকাব্য রচনা করিলেন।

মেঘনাদবধ বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্য। মহাকাব্য কাহাকে বলে—অথবা মহাকাব্যের লক্ষণ কি, আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। তৎপরে মেঘনাদবধ কাব্যখানি কোন শ্রেণীর মহাকাব্য তাহা বিবেচনা করিব।

প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন —খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য। মহাকাব্যের গঠন সম্বন্ধে প্রাচীন

আলঙ্কারিকগণ খানিকটা ধরা বাঁধা নিয়ম রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহাকাব্য অন্যূন আট সর্গে বিভক্ত হইবে—সর্গগুলি নাতি-দীর্ঘ ও নাতি-হ্রস্ব হইবে। কবি তাঁহার ইষ্টদেবতার স্তুতিবন্দনা করিয়া বা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলকামনা করিয়া কাব্যারম্ভ করিবেন। পুরাণান্তর্গত বা ইতিহাসের কোন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া কবি মহাকাব্য রচনা করিবেন। মহাকাব্যে নায়ক হইবেন ইন্দ্রাদি কোন প্রধান দেবতা, অথবা দেবতাস্বভাব সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত গুণ-সম্পন্ন কোন ক্ষত্রিয় নরপতি। মহাকাব্যে মূল আখ্যানবস্তুর সহিত স্বভাবের শোভা, নরপতি ও সেনাপতিদিগের মন্ত্রণা, সৈন্যচালনা ও যুদ্ধ, জন্ম মৃত্যু বিবাহ, বিরহ ও মিলন, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ও উৎসব, ঋতুবর্ণনা প্রভৃতির মধ্যে সমুদয়ই, অথবা কোন কোনটি সংযুক্ত হয়। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্ত্তী সর্গের বর্ণিত বিষয়ের আভাস দিতে হয়। সর্গগুলি একরূপ ছন্দে রচিত হইবে. তবে সর্গান্তে ছন্দ পরিবর্ত্তন ঘটিবে। সর্গান্তর্গত প্রধানতম বিষয়ের নামে সেই সর্গের নামকরণ হইবে। মহাকাব্যে বীর করুণ আদ্য শান্ত এই চারিটির কোন একটি রসের প্রাধান্য থাকে এবং অন্য তিনটি স্থায়ী ও হাস্য রৌদ্র ভয়ানকাদি রস অপ্রধান ও অস্থায়িভাবে বিদ্যমান থাকে। কবি কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়ক-নায়িকার নামে মহাকাব্যের নামকরণ হয়।

ইউরোপীয় আলঙ্কারিকগণের মতেও উপাখ্যান বা একটা সুসংবদ্ধ আখ্যায়িকাই এপিকের প্রাণ। ইউরোপীয় এপিকের মধ্যে মোটামুটি তিনটি উপাদান লক্ষিত হয়। প্রথমত ভাবাধার, দ্বিতীয়ত শব্দসম্পদ, তৃতীয়ত শব্দের বাঁধুনী। এপিকের পক্ষে এই তিনটিই অপরিহার্য্য। এপিকের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা চাই, নাটকের যাহা প্রাণ—অর্থাৎ ঘটনা এবং নিপুণ চরিত্রাঙ্কন তাহাও এপিকে থাকা চাই। এরিষ্টটল বলিয়াছেন —নাটকীয় গুণ না থাকিলে উচ্চাঙ্গের এপিকই হইতে পারে না।

এপিকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি গল্পাংশকে বাদ দিয়া কাব্যান্তর্গত চরিত্রগুলিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে চরিত্রগুলির যদি নাটকীয় অভিনয় না থাকে, তবে এপিকের সহিত উপন্যাস অথবা ইতিহাসের কোন পার্থক্য থাকে না। তাঁহার মতে চরিত্রের নাটকীয়ত্বের মধ্যেই এপিকের মাধুর্য্য এবং ঔৎকর্ষ নির্ভর করে। শব্দ-সম্পদও এপিকের প্রাণ—বাছিয়া বাছিয়া এপিক রচয়িতাকে শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে—কারণ ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য, ধ্বনির মধ্য দিয়া মনের মধ্যে একটা উদাত্ত ভাব জাগাইয়া তোলাই এপিক রচয়িতার কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণ এপিক কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া আরও বলিয়াছেন—একটা খুব অসাধারণ এবং গুরু-গম্ভীর বিষয় না হইলে যে এপিক লেখা যাইতে পারে না তাহা নহে। দৃশ্যকাব্যের উপযোগী এবং নাটকীয় কয়েকটি চরিত্র লইয়া এপিক রচনা করা যাইতে পারে। এপিকের লেখক যে প্রতিপদে ইতিহাসের অনুসরণ করিয়া চলিবেন তাহাও নহে। এ সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ স্বাধীন। তবে এপিকের গল্প এবং গল্পান্তর্গত চরিত্রসমূহ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় হওয়া চাই। এপিক রচয়িতা কবি ঐতিহাসিক বা পুরাণান্তর্গত আখ্যায়িকার সহিত স্বীয় কল্পনা যদৃচ্ছা মিশ্রিত করিয়া কাব্য রচনা করিতে পারেন।

এপিকের চরিত্রসমূহ ঐতিহাসিক হইয়াও ইতিহাসবর্ণিত কার্য্য-কলাপের একটিও না করিতে পারেন; এমন কি এপিকে তাঁহাদের ঐতিহাসিক কীর্ত্তিসমূহের উল্লেখ পর্য্যন্ত না থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন অসাধারণ ক্ষমতা ও এমন মহোচ্চ গুণাবলী থাকা চাই, যাহার সহিত লৌকিক সংস্কার জড়িত থাকে। সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, যাহা ঘটিয়াছে তাহার যথাযথ বর্ণনা এপিকের লক্ষণ নহে। কিন্তু ঘটনাবলীর মধ্যে এমন কিছু থাকা চাই যাহা অভূতপূর্ব্ব, চিরবিস্ময়কর এবং গৌরবময় ও হৃদয়োন্মাদক বলিয়া কবির প্রতীতি

জন্মে ; যাহা কবিকে প্রকৃতই মাতাইয়া তুলে এবং যাহা কবির কবিত্ব-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়। কবি তখন স্বচ্ছন্দবিহারী পক্ষীর মত আপন কল্পনাবলে ছবির পর ছবি আঁকিয়া যান তাঁহার কাব্যে। কবির এই কল্পনার প্রসারতা এবং চরিত্রচিত্রণের শক্তির উপরেই এপিকের উৎকর্ষ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মহাকাব্যের লক্ষণ আলোচিত হইল। বলা বাহুল্য যে মেঘনাদবধের কবি প্রতীচ্য আদর্শেই তাঁহার কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের প্রেরণাই মেঘনাদবধে খুব বেশী পরিমাণে বিদ্যমান।

ইউরোপীয় এপিক কাব্যের সংজ্ঞা মধুসূদনের মনে পরিষ্কাররূপেই বিদ্যমান ছিল। মহাকাব্য রচনায় মধুসূদন প্রতীচ্য গ্রীক আদর্শ এবং মিলটনের রচনাদর্শের একটা সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তাঁহার মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন। ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো প্রভৃতি মহাকবিদিগের প্রভাবও মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যখানিকে একখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্যে পরিণত করিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের কাঠামো (Form) রচনায় মধুসূদনের উপর গ্রীক মহাকাব্য রচনা রীতির প্রভাব সমধিক লক্ষিত হয়। রামায়ণ মহাভারত প্রাচ্য মহাকাব্য—এই দুই মহাকাব্যে যে রীতি বর্ত্তমান, মেঘনাদবধে তাহা অনুসৃত হয় নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে এক একটি সম্পূর্ণ ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু হোমার তাঁহার 'ইলিয়াড্' কাব্যে ট্রয় যুদ্ধের শেষ কয়েক মাসের ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই জন্য ইলিয়াড্ কাব্যখানিকে রামায়ণ বা মহাভারতের মত ঐতিহাসিক কাব্য বলা যায় না। মধুসূদন এই গ্রীক আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া মেঘনাদবধে লঙ্কাসমরের খণ্ডাংশকেই তাঁহার বক্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই আদর্শই মধুসূদনের সমস্থত্রে

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্যে' আসিয়া গিয়াছে। নবনীচন্দ্রের কাব্যসমূহেও এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে দেখিতে পাই।

মধুসূদনের মহাকাব্য মেঘনাদবধের উপর Milton-এর প্রভাবও কম নহে। মিল্‌টনের উপর মধুসূদনের ছিল অসীম শ্রদ্ধা—তাঁহার কাছে 'Milton is divine !' তাই ছন্দ, ভাব, রচনারীতি সকল বিষয়েই তিনি Milton-কেই সব চেয়ে বেশী অনুসরণ করিয়াছেন। ক্রমাগত যুদ্ধবর্ণনার ভিতর দিয়া মহাকাব্যে বীররস উৎসারিত করিবার অসার্থকতা তিনি বুঝিয়াছিলেন Milton অনুশীলন করিয়া। তাই ক্রমাগত যুদ্ধবর্ণনার ভিতর দিয়া বীররস উৎসারিত না করিয়া তিনি মেঘনাদবধের চরিত্রগুলিকে বীরত্বব্যঞ্জক করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—"Homer is nothing but battles. I have like Milton only one."

ভাবগভীরতা ও শব্দসম্পদ্ ইউরোপীয় এপিকের মূল উপাদান। মধুসূদনের মেঘনাদবধে উভয়ই বর্ত্তমান। মেঘনাদবধের সীতা ও সরমার কথোপকথন পাশ্চাত্য এপিকের Episode-এর আদর্শে রচিত। এরিষ্টট্‌লের মতে এপিক কাব্যের আদি, মধ্য ও অন্ত সরলভাবে কাব্যের উদ্দেশ্য ও ঘটনাবলী বর্ণনা করিবে। মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধে বর্ণে বর্ণে এই নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন। সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য'-খানি যেন এই নিয়মে সুরে বাঁধা হইয়াছে। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের ভাব, আখ্যায়িকা ও বহু চরিত্র অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত আকারে মেঘনাদবধে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের রসকে মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন।

একমাত্র মধুসূদনই বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্য রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার পরে আর কেহই মহাকাব্য রচনায় তেমন সুফলতা লাভ করেন নাই। হেমচন্দ্র মধুসূদনেরই অনুকরণে তাঁহার বৃত্রসংহার কাব্য রচনা করেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের রচনারীতি অপরিপক্ক। তিনি রঙ্গলালের মত Metrical Romance-এর পদ্ধতিই 'বৃত্রসংহারে'

ব্যবহার করিয়াছেন। হেমচন্দ্র তাঁহার 'বৃত্রসংহার কাব্যে' বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করিয়া ছন্দোবৈচিত্র্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার যেমন তাঁহার কাব্যের সুরটি খাটো করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি উহা এপিক রচনার অন্তরায় হইয়াছে। কারণ, বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করিয়া এপিক রচনা করা পাশ্চাত্য কাব্যদর্শনানুমোদিত নহে। কিন্তু মধুসূদনের মেঘনাদবধে এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের আধারে বিভিন্ন ভাব প্রকাশিত হইয়াছে—তাঁহার মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর ছন্দের দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, খুব উঁচু সুরে বাঁধা বীণা যেন ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে নানাবিধ কাব্যরস পরিবেশন করিতেছে। বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার না করিয়াও মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ছন্দোবৈচিত্র্য বজায় রাখিয়াছেন। ইহা অসীম ক্ষমতার পরিচায়ক। হেমচন্দ্র তাঁহার 'বৃত্রসংহার কাব্যে' এইরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

'বৃত্রসংহার কাব্যে'র ছন্দ মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দের মত মাধুর্য্যমণ্ডিত না হইলেও, বিষয়বস্তু নিরূপণে মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব অধিকতর। দধীচির তনুত্যাগ ও বজ্রগঠনে বাস্তবিক পক্ষে মহাকাব্যের উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন চিরাগত আদর্শ ও বিশ্বাসকে ভঙ্গ করিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে তাহাতে কাব্যের ক্ষতি হয় নাই। নানা স্থানে মধুসূদনের বর্ণনা মহাকাব্যের অনুরূপ বিস্ময়কর। কিন্তু হেমচন্দ্রের কাব্য অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার কাব্যে মহাকাব্যের সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্য নাই, এবং তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বর্ণনা। চরিত্রের মধ্য দিয়া বীররস উৎসারিত না করিয়া, ক্রমাগত যুদ্ধবর্ণনার ভিতর দিয়া 'বৃত্রসংহার কাব্য'কে বীররসপ্রধান করিতে যাওয়া কবির ভুল হইয়াছে। এই সকল কারণে এপিক লেখক হিসাবে হেমচন্দ্র সফলকাম হন নাই।

নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য আদর্শে বা আকারে মহাকাব্যের কোনও নিয়মই রক্ষা করিয়া চলে নাই। কাব্যের ভাব ও ভঙ্গিতে সেগুলি ঠিক মহাকাব্য হইয়া উঠে নাই। তাঁহার কাব্যে ভাবের ঐক্য নাই। তাঁহার রচনা অতিদীর্ঘ পগুসঙ্কুল, নানাবিষয়ক কাব্য-নিবন্ধ বা Poetical Essays মাত্র হইয়াছে। কাব্যের কোনও একটি অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের সুসামঞ্জস্যময় সম্বন্ধ নাই। এপিকের ঘটনাধারা যেমন এককভাবে বহিয়া যায়, নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলির ভাবধারা তেমন এককভাবে বহিয়া যায় নাই।

নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' এবং 'পলাশীর যুদ্ধ'কে মহাকাব্য বলা হয়। তাঁহার প্রথমোক্ত কাব্যত্রয়ের বিষয়বস্তুর গৌরব বেশ মহান্। সেখানে তিনি মহাভারতকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একটা বিশাল ভারতসাম্রাজ্য ও একটা বিরাট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছেন। আধুনিক যুগের ভাবধারার সহিত মহাভারতের আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাব্য রচনা তাঁহার কবিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কাব্যের মধ্য দিয়া তিনি নিপুণতার সহিত দেশানুরাগ এবং ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দেশানুরাগ এবং ধর্ম্মতত্ত্ব নিছক কল্পনা ও কবিত্বের উপর ভিত্তিলাভ করিতে পারে না। সেইজন্য তাঁহার কাব্যসমূহ মহাকাব্য হিসাবে তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মহাকাব্য ও Fiction এই দুইয়ের মিশ্রণে তাঁহার কোনও কাব্য মহাকাব্য হিসাবে সার্থক হয় নাই। 'পলাশীর যুদ্ধে' তাঁহার যে ঐতিহাসিক কল্পনার উন্মেষ দেখা দিয়াছে, তাহা ভাববহুল কল্পনার উচ্ছ্বাসে ডুবিয়া গিয়াছে। 'পলাশীর যুদ্ধে'র Formও ঠিক মহাকাব্যের অনুরূপ নহে—স্থানে স্থানে উপাখ্যান-কাব্যের সমাবেশে উহা মিশ্র আকার ধারণ করিয়াছে।

চিন্তা বা ভাবমূলক ভাবে দেখিতে গেলে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও

'প্রভাস' রচনায় নবীনচন্দ্র সফলতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই কাব্যত্রয়ের ভিতর দিয়া কবিত্বরস উৎসারিত হয় নাই। তত্ত্বকথা, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির প্রবল উচ্ছ্বাসে ঐ কাব্যত্রয়ের কাব্যসম্পদ্ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই কারণেই নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় সফল হন নাই।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে যে কয়খানি মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহাদিগের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, একমাত্র মধুসূদনই বঙ্গ-সাহিত্যে মহাকাব্য রচনায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য সত্যই এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি —মহাকাব্যের প্রেরণা, মাধুর্য্য, কল্পনাদর্শ প্রভৃতি মেঘনাদবধে যতখানি বর্ত্তমান, এই যুগে রচিত অন্য কোনও মহাকাব্যে উহা তত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান নাই। মেঘনাদবধে সুগ্রথিত কল্পনা ও কবিত্বের স্রোত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রবাহিত।

তবে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে আমরা যখন মহাকাব্য বলিব, তখন মনে রাখিতে হইবে যে হোমার অথবা ব্যাস বাল্মিকীর মহাকাব্য আর মধুসূদনের মহাকাব্য এক শ্রেণীর নহে। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতে ইউরোপীয় কাব্যজগতে দুই শ্রেণীর এপিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে —Epic of Growth এবং Epic of Art। এই শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা বাল্মিকী, ব্যাস এবং হোমারকে প্রথম শ্রেণীর এপিক লেখক বলা যায়। আর এই হিসাবে মিল্‌টন, ভার্জিল অথবা মধুসূদন দ্বিতীয় শ্রেণীর এপিক লেখক। রঘুবংশ প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্যও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর এপিকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, বাল্মীকি ও হোমারের যুগে প্রাচীনতম যে সকল কাহিনী মুখে মুখে বা গায়কদিগের দ্বারা বহুকাল ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, সেগুলি অমিত-প্রতিভাশালী কবিবিশেষ একত্র করিয়া একটি সুবৃহৎ কাব্যের আকারে রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সেইজন্য 'রামায়ণ' ও 'ইলিয়াড্' Epic of Growth; কিন্তু ভার্জিল ও মধুসূদন যথাক্রমে হোমার ও বাল্মীকির এপিক হইতে ঘটনাবিশেষ একত্র করিয়া করিয়া শিল্পনৈপুণ্যের সাহায্যে নূতন এপিক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর এপিক লেখক—অর্থাৎ ইঁহাদের মহাকাব্যসমূহ Epic of Art।

মধুসূদনের পরে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনায় আর কেহই সফলতা লাভ করেন নাই। বাংলা মহাকাব্যগুলিতে মহাকাব্যের বিরোধী লক্ষণ অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া একখানিও মহাকাব্য হইয়া উঠে নাই। অসীম প্রতিভাসম্পন্ন মধুসূদনও মহাকাব্যের রূপ ও আদর্শকে পরিপূর্ণ সার্থকতা দান করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, এপিকের অনুরাগী হইলেও মধুসূদনের কবিমানস ছিল রোমান্টিক। তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' যে রোমান্টিক বা অবাস্তব-মনোহর ভাবাবেগ দেখা গিয়াছিল, ঠিক সেই রোমান্টিসিজ্ম্ পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক আকারে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' বর্ত্তমান। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' প্রবল গীতিকাব্যের প্রেরণা কাজ করিয়াছে। ইহার অনেক স্থানে ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সেই সকল স্থানগুলিতে স্বভাবত এপিক কাব্যরস অপেক্ষা লিরিক ভাবাবেগ প্রবল হইয়াছে। মেঘনাদবধকাব্যে বাহিরের বস্তুজগৎ হইতে উপকরণ আহৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা কবির ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং আবেগের সৌন্দর্য্যে সমুদ্ভাসিত। মেঘনাদবধের মূলগত ভাবটি Lyric—এই Lyric ভাবটি রাবণের বিলাপে, রামচন্দ্রের মমতায়, প্রমীলার ক্রন্দনে সর্ব্বত্রই Epic-এর বাস্তব আবরণ ভেদ করিয়া উচ্ছ্বাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যের স্থানে স্থানেও এইরূপ লিরিক মাধুর্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে। মধুসূদন এবং তৎপরবর্ত্তী সকল মহাকাব্য-রচয়িতার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে প্রকৃতি-বর্ণনায় অথবা বিষাদে। চরিত্র-চিত্রণ অথবা ঘটনাবর্ণনাতে বাঙ্গালী মহাকবিদিগের কবিত্ব ও কৃতিত্ব তেমন

প্রকাশিত হয় নাই। ভাবপ্রবণতা বা লিরিক উচ্ছ্বাস মাইকেল, হেম, নবীনের কাব্যে এমনই প্রবলভাবে উৎসারিত হইয়াছে যে, কল্পনার সেই আবেগ এবং উচ্ছ্বাস মহাকাব্যরচনার অন্তরায় হইয়া কোনও কবির কোনও কাব্যখানিকে পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য হইয়া উঠিতে দেয় নাই।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে যে মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার জন্য পাশ্চাত্য মহাকবিদের মত অন্তরের ভাবরসের দিকে না চাহিয়া প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতেই বুঝি তাঁহার কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের মহাকাব্যের সমস্তটাই আত্মনিমগ্ন ভাবকল্পনাপ্রসূত—উহার আদ্যোপান্ত লিরিক আবেগ ছাড়া আর কিছুই নহে।

মধুসূদনের মেঘনাদবধে গীতিকবিতার আবেগ বা রোমান্টিক উচ্ছ্বাস প্রবল হওয়ায় কাব্যখানি পূর্ণ-পরিণত মহাকাব্য হইয়া উঠে নাই। লিরিক উচ্ছ্বাস বা রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর একটি মহাকাব্য-বিরোধী লক্ষণ মেঘনাদবধ কাব্যখানিকে পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য হইতে দেয় নাই। মহাকাব্যে নায়ক শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত হইবে, সে হইবে মহাশক্তিমান্, জয়ী হইয়া বীরের মত সে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। কিন্তু মেঘনাদবধে আমরা পরাজয়ের কারুণ্যের মধ্যেই কবিত্ব পাই। ইহাতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' শিল্প হিসাবে, কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মহাকাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হয় নাই। মহাকাব্য বিয়োগান্তক হইবে না। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য বিয়োগান্তক।

মাইকেলের অনুসরণে বঙ্গসাহিত্যে হেম নবীন মহাকাব্যই রচনা করেন। তথাপি এই শ্রেণীর কাব্য রচনা অতি অল্পকালের মধ্যে বন্ধ হইয়া গীতি-কবিতার ধারা পুনরায় আধুনিক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ কেন করিল, সেকথা আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। বঙ্গসাহিত্যে গীতি-কবিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রধানত তিনটি কারণ

ছিল। প্রথমত—ইংরেজিতে যাহাকে Epic বলা হয় এবং Homer-এর রচনা যাহার আদর্শ স্বরূপ, তাহা একমাত্র heroic যুগেই সম্ভবপর। রামায়ণ মহাভারত সেই শ্রেণীরই রচনা। কিন্তু কালিদাসের রঘুবংশ, মিলটনের কাব্য—এমন কি মধুসূদন প্রভৃতির কাব্য অনুকৃতিমূলক কাব্য। এগুলির মধ্যে আদিম যুগের বা জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্ম-প্রকাশ নাই। তাই কাব্য হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াও এই শ্রেণীর রচনা সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী হইল না।

মহাকাব্য রচনা বন্ধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ—উপন্যাস-সাহিত্যের উদ্ভব। যতদিন বঙ্গসাহিত্যে আখ্যায়িকা বর্ণনার উপযোগী গদ্যের উদ্ভব হয় নাই, ততদিন কাহিনী বর্ণনার জন্য মহাকাব্যের (মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিরও) প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গদ্যের পুষ্টি ও পরিণতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে এবং উপন্যাস-সাহিত্যের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী বর্ণনার বাহন যখন পাওয়া গেল তখন পৌরাণিক উপাখ্যান-কাব্য ও মহাকাব্য রচনার প্রয়োজনীয়তাও ফুরাইল।

তৃতীয়ত—হেম নবীন যদিও মধুসূদনের অনুসরণে মহাকাব্য রচনা করেন তথাপি তাঁহাদের একখানি কাব্যও মহাকাব্য হিসাবে মধুসূদনের মহাকাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় নাই। মধুসূদন যদিও বাংলা ভাষা ও ছন্দকে এপিক রচনার উপযোগী করিয়া তুলিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার পরে যে কয়খানি মহাকাব্য বঙ্গভাষায় রচিত হইল, তাহার একখানিও এপিক বা মহাকাব্য হিসাবে পূর্ণাঙ্গ হইল না। ফলে মহাকাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী হইল না। মধুসূদনের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মহাকাব্য যদি সেই যুগে রচিত হইত, তাহা হইলে হয় ত বাংলা সাহিত্যে narrative epic শ্রেণীর কাব্য উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিত এবং আধুনিক যুগোপযোগী নব-গীতিকাব্যের অভ্যুদয় হওয়া সত্ত্বেও মহাকাব্য রচনাও বাংলা সাহিত্যে হইতে থাকিত। কিন্তু মধুসূদনের মেঘনাদবধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর

মহাকাব্য বঙ্গসাহিত্যে আর রচিত হইল না বলিয়া, অচিরকালের মধ্যেই বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্য রচনার প্রথা আর অনুসৃত হইল না। যে গীতিকবিতা অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম গৌরবস্থল ছিল সেই গীতিকবিতার মধ্য দিয়াই বঙ্গের কবিগণ আপনাদিগের কবিপ্রতিভা প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইলেন। এই পথ দেখাইয়াছিলেন, সেই মহাকাব্য রচনার যুগেই আবির্ভূত এক কবি—তিনি কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। মহাকাব্য রচনার যুগে আবির্ভূত হইয়া, মহাকাব্য রচনা করা সত্ত্বেও মধুসূদন, হেম, নবীনের মহাকাব্যে ও উপাখ্যানকাব্যে একটি প্রচ্ছন্ন গীতিকবিতার সুর অনুরণিত হইতেছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। প্রকাশ্যভাবেও ইঁহারা প্রত্যেকেই অনিন্দ্যসুন্দর গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এ যুগের গীতিকবিতার সেই সুরটি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিহারীলালের কাব্যের মধ্য দিয়া পূর্ণপরিণতভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। নব-গীতিকবিতার সেই বেণুবীণানিক্বণে সমগ্র বাংলা কাব্যসাহিত্য প্লাবিত হইয়া গেল।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

গীতিকাব্যের প্রতি মধুসূদনের একটা আকর্ষণ ছিল। তাঁহার কবিমানসে রোমান্টিক কাব্যাদর্শও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

"I must suppose that I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghnad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think, I have a tendency in the Lyrical way."

লিরিকের প্রতি কবির যে একটা প্রবল আসক্তি ছিল, 'মেঘনাদবধ কাব্য'ও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ কাব্যের অনেক স্থলই লিরিক উচ্ছ্বাস। মেঘনাদবধ রচনার পরে তিনি আর বীররসাত্মক কাব্য রচনা করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্পবশে তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' গ্রীক ওডের সমশ্রেণীর। ইহার রূপ (Form) এবং গঠনরীতিতে (Technique) কবি গ্রীক ওড্-রীতিকেই আদর্শ করিয়াছেন। কোনও একটি বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নানা ছন্দে বা একেবারে স্বাধীন ছন্দে (*Vers Libers*) সম্বোধন বা হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তিই ওডের বিশেষত্ব। এই কাব্যে কবি সেই বিশেষত্বটুকু বজায় রাখিয়াছেন। কবি এখানে রাধাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার নিজেরই অনুভূতি রাধার বেনামী অভিব্যক্ত করিয়াছেন—রাধার দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছেন।

'ব্রজাঙ্গনা' গীতিকাব্য। ইহা Love Lyric বা প্রেমগীতিকা। রাধাবিরহ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিষয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের অবর্ত্তমানে বিরহিণী রাধিকার কাতর ও করুণ বিলাপ এই কাব্যের মধ্যে অভিব্যক্ত

হইয়াছে। রাধার সম্মুখ দিয়া যমুনার নীলজল কলধ্বনি করিয়া বহিয়া যাইতেছে, কেশরকান্তি কদম্বফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, মাধবীলতা তমালতরুকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, তরুশাখায় শিখিনী কেকারব করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে, বিকশিত নলিনীর পরাগরেণু অঙ্গে মাখিয়া মধুমত্ত ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, ঊষাদেবী আবির্ভূতা হইয়া সকল অন্ধকার দূর করিতেছেন, মলয়-মারুত মৃদু-মধুর সৌরভ বিকীরণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে—বৃন্দাবনে সকলই আছে। কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণের অভাব, আর সেই অভাববশতঃ রাধার নয়নে সকলই আঁধার, সকলই শূন্য। মুরলী-ধ্বনি শুনিয়া রাধিকার ব্যাকুলতা বাড়িয়াছে—যমুনাতটে গিয়া রাধার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। জলধর দেখিয়া—

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকা-রব করি',
হেরি' ব্রজ-কুঞ্জবনে, রাধা, রাধা-প্রাণধনে
নাচিত যেমতি যত গোকুল-সুন্দরী।
উড়িতেছে চাতকিনী, শূন্য পথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি' ধনী—জলদ কিঙ্করী।

কিন্তু রাধিকার নিকট ঐ সকল দৃশ্য পীড়াদায়ক। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

হায় রে, কোথায় আজি শ্যাম-জলধর!

গোধূলি আগমনে বিরহিণী রাধিকা বলিয়াছেন—

কোথা, রে, রাখাল-চূড়ামণি!
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি!
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব!

বসন্ত-সমাগমে রাধিকার মনে হইয়াছে যে তাঁহার প্রিয়তম নিশ্চয় ফিরিয়াছেন, নহিলে বনে বনে কুসুম মুকুলিত হইবে কেন—কেন কোকিলের কুহুধ্বনি, ভ্রমরের গুঞ্জন, মলয়-সমীরে তরঙ্গায়িত যমুনার নৃত্য হইবে? উন্মাদিনী রাধিকা ভাবিয়াছেন যে বিশ্বপ্রকৃতির যখন এত সাজ তখন 'শ্যামরাজ' আসিয়াছেন নিশ্চয়। বিরহিণী রাধিকা প্রিয়মিলনের আশায় আশান্বিতা হইয়া বলিতেছেন—

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে!
পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,—চল্, লো, বনে!
চল্, লো, জুড়াব আঁখি, দেখি' ব্রজরমণে!

সখি রে,—
উদয়-অচলে ঊষা, দেখ, আসি' হাসিছে!
এ বিরহ-বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধরি'
এবে, লো, রব কি করি?—প্রাণ কাঁদিছে!
চল্, লো, নিকুঞ্জে, যথা কুঞ্জ-মণি নাচিছে!

সখি রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী!
ধূপ-রূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল'
বিহঙ্গমকুল-কল, মঙ্গলধ্বনি!
চল্, লো, নিকুঞ্জে, পূজি শ্যামরাজে স্বজনি!

সখি রে,—
পাদ্য-রূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে!
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব-পদে;
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে ভাবিয়া মনে!
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে, লো সঘনে!

সখি রে,—

এ যৌবন-ধন, দিব উপহার রমণে!

ভালে যে সিন্দুর-বিন্দু হইবে চন্দন-বিন্দু,—

দেখিব লো, দশ ইন্দু স্থ-নখগণে!

চিরপ্রেম বর মাগি' লব, ওলো ললনে!

এখানে রাধিকার করুণকোমল হৃদয়ের মাধুর্য্যটুকু কবি অতিশয় নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনার সর্ব্বত্রই এইরূপ কবিত্বস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং বিহরিণী রাধিকার রূপটি উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ব্রজাঙ্গনায় অচেতন প্রকৃতির প্রতি কখনও বা রাধার অভিমান প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন—

এই যে কুসুম, শিরোপরে পরেছি যতনে,

মম শ্যামচূড়া-রূপ ধরে এ ফুল-রতনে!

বসুধা নিজ কুন্তলে, পরেছিল কুতুহলে

এ উজ্জ্বল মণি,

রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া,

মোর কৃষ্ণচূড়া কেন, পরিবে ধরণী?

কখনও রাধিকা ময়ূরী ও সারিকার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

তরুশাখা উপরে, শিখিনি!

কেন, লো, বসিয়া তুই বিরস বদনে?

না হেরিয়া শ্যামচাঁদে' তোরো কি পরাণ কাঁদে?—

তুইও কি দুঃখিনী?

আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?

পিঞ্জরাবদ্ধ সারিকার মত অবস্থা রাধিকার। তাই তিনি বলিয়াছেন—

কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ?
ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে, রে
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতি-বিম্ব—তেমতি তরল !
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি !

ব্রজাঙ্গনায় বিরহ-বিধুরা রাধিকার বিহ্বল অবস্থা নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বংশী-ধ্বনি শুনিয়া তিনি কখনও বা বিরহতপ্ত, কখনও বিরহবশে তিনি অভিমানিনী, কখনও বা তিনি বিরহ অবসানের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন পৃথিবীর নিকট, অথবা গিরি-গোবর্দ্ধনের নিকট; কখনও আশা পোষণ করিয়াছেন যে শ্যাম ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ব্রজাঙ্গনার ভাব ভাষা ও ছন্দে বিশিষ্টতা আছে। ব্রজাঙ্গনার রাধিকায় মাধুর্য্য-ভাবই প্রধান। এই কাব্যে রোমান্টিক আদর্শের Subjective কল্পনা বর্ত্তমান। রাধিকা তাঁহার নিজের আনন্দ-বেদনা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি নিজে বিরহিণী, তাই যমুনা-তটে গিয়া যমুনার বিরহই তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে।

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবালিনি !
কি কহিছ, ভাল ক'রে কহ না আমারে।
সাগর বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি।
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী !

* * *

এসো, সখি! তুমি আমি বসি এ বিরলে।
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে,
তব কূলে, কল্লোলিনি! ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে!

এই যে বিশ্বপ্রকৃতিতে মানবীয় ভাব আরোপ করিয়া দেখা এইখানেই আধুনিকতা। ব্রজাঙ্গনায় ভাব ভাষা ও ছন্দের ব্যবহারে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট।

* 'ব্রজাঙ্গনা'র বিরহিণী- রাধিকার ব্যাকুলতা আর বৈষ্ণব কাব্যের বিরহ-বিধুরা আরাধিকা শিরোমণি শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ এক জিনিস বলিয়া মনে করিলে আমরা ভুল করিব। রাধাচিত্র অঙ্কনে মধুকবি কোনওরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হন নাই—'ব্রজাঙ্গনা'য় রাধা প্রেমময়ী মানবী এবং তাঁহার বিরহাবস্থা বর্ণনা করাই কবির লক্ষ্য। এই জিনিসটি উপলব্ধি করিলে তবে আমরা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রস-গ্রহণে সমর্থ হইব। মধুসূদন বৈষ্ণব কবিদের মত সাধক-কবি ছিলেন না, সেইজন্য তাঁহার ব্রজাঙ্গনায় বৈষ্ণবকাব্যের আধ্যাত্মিকতার অভাব। কিন্তু মধুসূদন ছিলেন প্রকৃত কবি—তিনি রচনা করিতেন ভাবের আবেগে। এই কারণে আধ্যাত্মিকতা না থাকিলেও ব্রজাঙ্গনায় কবিত্ব আছে। আর আছে বিরহিণী রমণীর অন্তররহস্য-বিশ্লেষণ। এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয় বলিয়াছেন—

"শুধু কাব্য-প্রতিভা-বলে কাব্যাংশে সাধক-কবির কতখানি সমকক্ষ হওয়া যায়, এই ব্রজাঙ্গনা কাব্যখানি তাহার চমৎকার নিদর্শন।"

বৈষ্ণব কবিতায় যেমন বিচিত্র ভাবের অনুভূতি অভিব্যক্ত হইয়াছে—সেখানে যেমন রাধা-প্রেমের বিবিধ অবস্থা,—পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, ব্রজাঙ্গনায় তাহা নাই। কবি

এখানে কেবলমাত্র রাধার বিরহব্যাকুলা মূর্ত্তিটি নিপুণ তুলিকাস্পর্শে উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়াছেন। এ রাধা ভক্ত বৈষ্ণবের পরমাপ্রকৃতি রাধা নহেন। ইনি বিরহ-কাতরা রমণী মাত্র। ব্রজাঙ্গনার রাধায় চিরন্তন-কালের বিরহিণী রমণীর ব্যাকুলা মূর্ত্তিটিই দেখিতে পাইব। এই কাব্যে বিষাদময়ী রমণীর প্রতি কবির সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধার চিত্র জয়দেব ও বিদ্যাপতি হইতে অনুকৃত হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন এমন একজন কবি ছিলেন যাঁহার নিপুণ তুলিকাস্পর্শে সকল জিনিসই অভিনব রূপে রূপায়িত হইয়া উঠিত। এই কাব্য রচনাতেও মধুসূদন সেইরূপ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছেন। রাধিকার চিত্রাঙ্কনে কবি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। রাধিকার অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্য 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সর্ব্বত্রই অতি উজ্জ্বল বর্ণে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধিকায় ভোগলালসা এতটুকু নাই। এইজন্য মধুসূদনের কাব্যের টীকাকার শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয় বলিয়াছেন—

"মধুসূদন রাধাভাবের রস-মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে। কিন্তু তাঁহাদের রাধিকায় ভোগ-লালসার প্রাচুর্য্য দেখিয়া, তিনি এই কাব্যে ভোগ-লালসার অতীত দিব্যোন্মাদের যে অনাবিল রসমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবাদর্শ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নয়।"

ব্রজাঙ্গনায় বৈষ্ণব কাব্যের রসধারা প্রবাহিত না হইলেও ইহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে। শ্রীরাধার করুণ বিলাপ-ধ্বনি আমাদের অন্তর স্পর্শ করে।

এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দের মাধুর্য্য সম্পাদনেও কবি বৈষ্ণবকাব্যের অনুকরণ করেন নাই। ইহার ভাষা ও ছন্দ বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন সম্পদ। বৈষ্ণব কবিতার ছন্দ পয়ার ও ত্রিপদী। কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা'য় কবি পয়ার ও লাচাড়ীর সংমিশ্রণে নূতন নূতন মিশ্র ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রসার-ধর্ম্মী পয়ার ও নৃত্যধর্ম্মী লাচাড়ী ছন্দের সংমিশ্রণে

যে কত অগণিত মিশ্রছন্দের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহা মাইকেলের পূর্ব্বে আর কোনও কবি ধারণা করিতে পারেন নাই। ইহা ইটালীর মিশ্রছন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত নূতন সৃষ্টি। ক্রমাগত পয়ার অথবা লাচাড়ী ছন্দ ব্যবহার করিলে কাব্য বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে—ছন্দে নূতনত্বের সুর অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' এই মিশ্র ছন্দ প্রবর্ত্তন করেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য—

"I have made up my mind to write (*Deo Volente*!) three short poems in Blank-Verse, and then do something in rhyme ; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No ! I mean to construct a stanza like the Italian *Ottava Rima* and write a romantic tale in it."

মেঘনাদবধে কবি ছন্দকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দুরূহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু গীতিকাব্যের উপযোগী ভাষা ব্যবহারেও মধুসূদনের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। 'ব্রজাঙ্গনায়' কবি গীতিকাব্যের উপযোগী অতি সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত ছন্দসৌষ্ঠব ও ছন্দমাধুর্য্য বজায় রাখিয়াছেন।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' কবির অনুপ্রাসে কোনও কষ্টকল্পনা নাই। যেমন—

কেন এত ফুল তুলিলি স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা ?
আর কি পরিবে কভু ফুল-হার
ব্রজ-কামিনী ?

কেন, লো, হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার ?—
হতভাগিনী !

ইহার অনুপ্রাস ইংরেজ কবি কীট্‌সের কাব্যের অনুপ্রাসের মতই সুমধুর।

অনেকে মধুসূদনকে কেবল অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা হিসাবে জানেন। কিন্তু মিত্রছন্দে কাব্যরচনা করিয়া তিনি যে উহাকেও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যদান করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। মিত্রাক্ষর ছন্দকেও মধুসূদন নূতন ধ্বনিমাধুর্য্য দান করিয়া গিয়াছেন। এজন্য বলিতে হয় যে মধুসূদন যদি আর কোনও কাব্য রচনা না করিয়া, এই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'খানি রচনা করিয়া যাইতেন তাহা হইলে একমাত্র ইহার দ্বারাই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র জন্য মধুসূদন 'বিহার' নামক একটি সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মধুসূদনের অনেক কাব্যই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যেমন, তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'সিংহল-বিজয় কাব্য' প্রভৃতি। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু কবির নিকট হইতে বঙ্গসাহিত্য যাহা পাইয়াছে তাহাই আমাদিগকে নূতনত্বের আস্বাদন দিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে যাহা কখনও ছিলনা, তাহাই তিনি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন।

ব্রজাঙ্গনার 'বিহার' নামক সর্গের কয়েকটি মাত্র পংক্তি মধুসূদন রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি পাঠ করিলেই উহার মাধুর্য্য উপলব্ধি হইবে—

সাজ সাজ ব্রজাঙ্গনে, বঙ্গে ত্বরা করি'।
মণি মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে,
ওই শুন পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥
নাচিছে লো নিতম্বিনী কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর
দুলিছে লো বরগুঞ্জ মালা পর গলে॥
মেঘ সনে সৌদামিনী সমরূপে, লো কামিনী,
ঝলে পীতধড়ারূপে ঝল ঝল ঝলে॥

ভাষা, ছন্দ ও ভাবমাধুর্য্যে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'-খানি বঙ্গসাহিত্যে একটি মহা-মূল্যবান্ সম্পদ্। ইহার ভাষা সরল এবং স্বচ্ছ, ইহার ছন্দ ইটালীর মিশ্রছন্দের আদর্শে সৃষ্ট। এই কাব্যের ছন্দমাধুর্য্য এবং রাধিকার মাধুর্য্য-ভাব আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। মধুসূদন নিজে তাঁহার এই গীতিকাব্যখানি বড় ভালবাসিতেন—মিল্‌টন যেমন তাঁহার প্যারাডাইস্ লষ্ট্ অপেক্ষা 'লালেগ্রো' নামক গীতিকাব্যখানিকে ভাল বলিতেন, মধুসূদনও তেমনি বলিতেন—

"My Brajangana is better than my Meghnad."

বীরাঙ্গনা কাব্য

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মত বীরাঙ্গনাও লিরিক কাব্য। ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে বীরাঙ্গনা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কাব্য সম্বন্ধে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—

'It followed the *Meghnadbadha*, and there is the same gorgeous imagery, the same rich poetic diction and the same musical variously modulated versification.'

তিলোত্তমাসম্ভব এবং মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বীরাঙ্গনাকাব্যে পূর্ণ-পরিণত হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। বীরাঙ্গনা কাব্যের ছন্দের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ইহার সর্ব্বত্রই একটি সঙ্গীতধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া কাব্যখানিকে পরম উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। কবিত্বশক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' উৎকৃষ্ট ; কিন্তু ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে মধুকবির বীরাঙ্গনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

বীরাঙ্গনা কাব্যের (Form) বা গঠনরীতি যেরূপ, সেই রীতি বঙ্গসাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে আর ছিল না। এই কাব্যে কবি পত্রাকারে কাব্য রচনা করিয়াছেন। পুরাণান্তর্গত বিভিন্ন নায়িকা তাঁহাদের পতি ও বাঞ্ছিতের উদ্দেশে পত্রপ্রেরণ করিতেছেন। ইহাই বীরাঙ্গনার বিষয়বস্তু। এই শ্রেণীর কাব্য মধুসূদনের নূতন সৃষ্টি। রোমের সুপ্রসিদ্ধ কবি ওভিদের (Ovid) বীরপত্রাবলীর আদর্শে বীরাঙ্গনার পত্রগুলি রচিত। এই কাব্য রচনাকালে কবি একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহা এখানে প্রণিধানযোগ্য। পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত হইল।—

"Within the last few weeks, I have been scribbling the thing to be called বীরাঙ্গনা, i. e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords."

পত্রাকারে যে কাব্য রচনা করা সম্ভব, এই জ্ঞানের জন্য মধুসূদন ওভিদের নিকট ঋণী ; কিন্তু ভাব ভাষা কবিত্ব প্রকাশভঙ্গী এ সবই কবির নিজস্ব,—বর্ণনীয় বিষয় ভারতীয়। ওভিদের কাব্যের নায়িকাগণ গ্রীস বা রোমের পুরাণ-প্রসিদ্ধা নায়িকা। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যে আমাদের দেশেরই পৌরাণিক এক একটি আখ্যায়িকাকে কেন্দ্র করিয়া কবির কবিত্বশক্তি উৎসারিত হইয়াছে। বীরাঙ্গনা কাব্যে দেশীয় আখ্যায়িকা-সকল নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে বিদেশী কাব্যের Form-এর আধারে।

বীরাঙ্গনা পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইহাতে মৌলিকতার অভাব নাই। ইহার প্রত্যেকটি পত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে মনোহর—প্রত্যেকটিতে নব নব ভাব পল্লবিত। কবি দক্ষতার সহিত নায়িকাদিগের অন্তর-রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের প্রেমপূর্ণ অন্তর্জগৎ আমাদের নিকট খুলিয়া মেলিয়া ধরিয়াছেন। বীরাঙ্গনায় ১১খানি পত্রিকা আছে। তন্মধ্যে একমাত্র জনার পত্রিকাখানি ভিন্ন অন্য সবগুলিই প্রণয়-প্রত্রিকা। জনার পত্রিকা আগাগোড়া বীর-রসাত্মক।

বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রেম পত্রিকা ও বীর-রসাত্মক পত্রিকাগুলির মধ্যে আবার চারিটি শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

১। প্রেম-পত্র—তারা, শূর্পনখা, উর্ব্বশী, রুক্মিণীর পত্র এই-শ্রেণীতে পড়ে। এই সকল প্রেমিকা নিজ নিজ প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া পত্ররচনা করিয়াছেন। প্রেমিকা তারা —সধবা, শূর্পনখা—বিধবা, উর্ব্বশী—বারবণিতা, রুক্মিণী—কুমারী ;—নারীজীবনের সম্ভাব্য চারি অবস্থার Type। কিন্তু এই চারিজনের পত্রে প্রত্যেকেরই চরিত্র ও প্রেম-নিবেদনের পার্থক্য সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে।

উর্ব্বশী পত্রিকা ঃ—উর্ব্বশী স্বর্গের অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা—সে অনন্তযৌবনা রূপোপজীবিনী। সখী চিত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া কুবের ভবন হইতে ফিরিবার সময়ে কেশী নামক দৈত্য তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তখন পুরুরবা দৈত্যহস্ত হইতে সখীসহ উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। ইহাতে উর্ব্বশী রাজা পুরুরবার প্রতি অনুরক্তা হয়।

অতঃপর একদিবস রাত্রিকালে স্বর্গলোকে ইন্দ্রসভায় নাটকের অভিনয় হইতেছিল। সৌন্দর্য্যলোকের সেই নন্দনকাননে অবস্থান করা সত্ত্বেও উর্ব্বশীর মন মর্ত্ত্যের পুরুরবার সহিত মিলিত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য নৃত্যকালে অন্যমনস্কতায় তাহার তালভঙ্গ হয়। ফলে অভিশপ্তা হইয়া নর্ত্তকী উর্ব্বশী স্বর্গভ্রষ্টা হয়।

পুরাণের এই কাহিনীটিকে অবলম্বন করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস তাঁহার বিক্রমোর্ব্বশী নাটকখানি রচনা করেন। কালিদাসের নাটকের সেই আখ্যায়িকা মধুসূদনকেও তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের উর্ব্বশী পত্রিকার রচনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে। উর্ব্বশী পত্রিকায় রূপোপজীবিনী উর্ব্বশীর প্রণয়নিবেদন ব্যক্ত হইয়াছে।

উর্ব্বশী তাহার পত্রিকারম্ভে তাহার স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার কাহিনী প্রথমে বিবৃত করিয়াছে। সে অকপটে বলিয়াছে যে পুরুরবার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিবশত অভিনয়কালে সে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল যে রাজা পুরুরবার প্রতি সে আসক্ত। ফলে সে অভিশপ্তা হইয়া স্বর্গভ্রষ্টা। কিন্তু তাহাতে সে ক্ষুব্ধা নহে। পুরুরবার প্রেম লাভ করিলে সে নিজেকে ধন্যা মনে করিবে। সে তাহার সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বলিয়াছে যে পুরুরবার প্রতি আকর্ষণ দুর্ব্বার,—তাহার প্রেম—

> যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে
> অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
> স্থির আঁখি সূর্য্যমুখী !

লক্ষ্মণের প্রতি আসক্তা সূর্পণখাও বিহ্বলা হইয়া সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখীর মত অপলকনেত্রে চাহিয়া থাকিত।—

গতিহীনা লজ্জা ভয়ে কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর,—হায়, সূর্য্যসুতা
চাহে যথা স্থির আঁখি সে সূর্য্যের পানে!—

সূর্পনখা পত্রিকা।

পুরুরবার প্রতি অনুরক্তা উর্ব্বশীর প্রেম যদি রাজা প্রত্যাখান করেন তবে উর্ব্বশী সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবে।

যদি ঘৃণা কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি!
আমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর; ঘোর বনে পশি' আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনী বেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর!

আর পুরুরবা যদি উর্ব্বশীর প্রতি সদয় হন তাহা হইলে সে পরমানন্দে তাঁহার সহিত মিলিত হইবে।—

দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি'
পড়ি ও রাজীব পদে, পড়ে বারিধারা
যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহিত মিশিতে আমোদে।

উর্ব্বশী রূপব্যবসায়িনী বলিয়া রূপযৌবনের প্রলোভনকেই সে প্রবল বলিয়া জানিত—তাই রূপযৌবনের প্রলোভন দেখাইয়া সে রাজা পুরুরবাকে ভুলাইতে চাহিয়াছিল।—

কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ; সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবনসুধা—অর্পিব তা পদে!

বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি' তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে।

সোমের প্রতি তারা ঃ—বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকা তারার প্রণয়-ভিক্ষা হৃদয়গ্রাহী। দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে অবস্থানকালে সোমের প্রতি গুরু-পত্নী তারা অনুরক্তা হন। সোমের রূপ এবং সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা হইয়া তারা তাঁহাকে একখানি প্রেম-পত্রিকা প্রেরণ করেন। তারার প্রেম-পত্রিকাখানি রুচিবিগর্হিত হইলেও কবিত্বমণ্ডিত।

তারা এবং সূর্পনখার প্রেমে রূপজ মোহই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—উর্ব্বশী পত্রিকায় রূপজ মোহের সহিত কৃতজ্ঞতা, বীরত্বানুরাগ প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া তাহা অপরূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু তারার পত্রিকায় রূপজ মোহই প্রধান।

সোমকে প্রথম সন্দর্শনের আনন্দ ব্যক্ত করিয়া তারা লিখিয়াছেন।

যে দিন, প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনী সম এ পরাণ মম
উল্লাসে। ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে।

পত্রিকার আর এক স্থানে তারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে শুধু যে প্রণয়িনীর হৃদয়-বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে—উহার ভিতর দিয়া অনুরক্তা কামিনীর অন্তরের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।—

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে
সুধানিধি, মুদি আঁখি ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্ব্বাদ ছলে মনে নমিতাম আমি।

সধবা তারা স্বীয় পতির শিষ্যের প্রতি অনুরক্তা হইয়া উন্মার্গ-গামিনী হইয়াছিলেন—অসংযত প্রবৃত্তির অধীনা হইয়াও তিনি নিজের পাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং অনুতাপ করিয়াছেন।

—হা ধিক, কি পাপে
হায় রে কি পাপে বিধি, এ তাপ লিখিল
এ ভালে ? জনম মম মহাঋষিকুলে ;
তবু চণ্ডালিনী আমি !

রুক্মিণী পত্রিকা :—তারা, সূর্পনখা, উর্ব্বশী—ইহাদের সকলের প্রেম-পত্রিকাতেই রূপলুব্ধতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু রুক্মিণীর প্রেম-পত্রিকাখানির মধ্যে ইন্দ্রিয় পিপাসার নাম গন্ধ নাই, রূপ যৌবনের প্রসঙ্গ নাই। রুক্মিণী তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বর্ণনা শুনিয়া—তাঁহাকে না দেখিয়াই, তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছেন। রুক্মিণী দেবীর যৌবনসমাগমে তাঁহার মাতা তাঁহার সহিত শিশুপালের বিবাহ দিতে প্রয়াসী হন। সেই কারণে কুলবালা হইয়াও তিনি তাঁহার প্রিয়তমকে প্রেম নিবেদন করিয়া পত্র দিতেছেন, তাঁহাকে কালরূপী শিশুপালের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। রুক্মিণী পত্রিকায় পূর্ব্বরাগের যে চিত্রটি ফুটিয়াছে তাহা কবিত্বমণ্ডিত। ভাগবতে রুক্মিণীকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে পত্রিকা প্রেরণের কথা আছে। ভাগবতের সেই আখ্যায়িকা অনুযায়ী মধুসূদনের এই পত্রিকাখানি রচিত হইলেও, মধুসূদনে সেই আখ্যায়িকা কবিত্বমণ্ডিত হইয়া রূপায়িত হইয়াছে। কবির বর্ণনা ভাগবতানুযায়ী সত্য, কিন্তু ভাগবতের রুক্মিণী মধুসূদনের কাব্যে নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল ও সমুদ্ভাসিত,—প্রেম-ভক্তির এক অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর চিত্র।

সূর্পনখা পত্রিকা :—মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধকাব্যে রাক্ষসদিগকে যেমন বীভৎস জীবরূপে কল্পনা করেন নাই, তেমনিই তিনি তাঁহার বীরাঙ্গনায় সূর্পনখাকে ভীষণাকৃতিরূপে কল্পনা করেন নাই। কবি

তাঁহার রচিত সূর্পনখা-পত্রিকার ভূমিকাতেই বলিয়াছেন যে, "এই পত্রিকাখানি পড়িতে হইলে বাল্মিকী-বর্ণিত বিকটা সূর্পনখাকে ভুলিতে হইবে।" বাল্মিকী রামায়ণে রাক্ষসগণ বীভৎস জীবরূপে বর্ণিত। কিন্তু মধুসূদন সেই রাক্ষসগণের মধ্যেও প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি, স্বামীভক্তি প্রভৃতি বিবিধ গুণের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছেন।

সূর্পনখা বালবিধবা। লক্ষ্মণের তরুণ যৌবনের অনিন্দ্য কান্তি তাহার মন হরণ করিয়াছে। তাই লালসায় অধীর হইয়া সে পত্রিকা-সাহায্যে লক্ষ্মণের প্রতি তাহার প্রেম নিবেদন করিয়াছে। পত্রখানির ছত্রে ছত্রে সূর্পনখার রূপজ মোহের কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

রামায়ণে লক্ষ্মণের রূপে সূর্পনখার মুগ্ধা হইয়া প্রেম-নিবেদনের কথা আছে। সেই কাহিনীটি কালিদাসের রঘুবংশম্ কাব্যেও অনুসৃত হইয়াছে। উহাকে অবলম্বন করিয়া মধুসূদনের এই পত্রিকাখানি রচিত। কাব্যাংশে পত্রিকাখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সূর্পনখার পূর্ব্বরাগ কবিত্বমণ্ডিত।

রাক্ষসগণ মায়ারূপ ধারণ করিতে সমর্থ ছিল। সুতরাং মধুসূদন সূর্পনখাকে মায়াবিনী সুরূপা করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। সূর্পনখা লক্ষ্মণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বলিয়াছে—

> কোন্ যুবতীর নবযৌবনের মধু
> বাঞ্ছা তব ? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
> (কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে।

সূর্পনখা যে মায়ারূপ ধারণ করিতে সমর্থা, এখানে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণকে একাকী পঞ্চবটীবনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া সে তাঁহাকে অবিবাহিত ভাবিয়াছে এবং তাঁহার প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছে। তাঁহার সেই নবযৌবনে লক্ষ্মণ কেন শিরে জটাজুট

ধারণ করিয়া পঞ্চবটী বনে ভ্রমণ করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য সূর্পনখার কৌতূহল জন্মিয়াছে। সে তাহার পত্রিকায় লক্ষ্মণকে ঐশ্বর্য্য-সুখের প্রলোভন দেখাইয়াছে—

তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।—
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র; দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,
রথ গজ অশ্ব রথী—অতুল জগতে!
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী
ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—তুমি আদেশিলে!
* * *
যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র;—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ, নতুবা কুহকে
শুষি' রত্নাকরে, লুটি দিব রত্নজালে!
মনি-যোনি খনি যত, দিব, হে, তোমারে!

আর, লক্ষ্মণ যদি পৃথিবীর সুখ-সম্পদের প্রত্যাশী না হন, তবে সূর্পনখা তাঁহাকে স্বর্গের সুখও আস্বাদন করাইতে সক্ষম। লক্ষ্মণ যদি পার্থিব ও স্বর্গীয়—উভয়বিধ সুখের প্রতি উদাসীন হন, যদি তিনি সন্ন্যাসীরূপেই জীবন যাপন করিতে চাহেন, তবে সূর্পনখা সন্ন্যাসী লক্ষ্মণের সহচরী হইয়া থাকিতেও প্রস্তুত।—

ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে;
নহে, কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ-ভূষণ ত্যজি, উদাসীনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেণী,

মণ্ডি জটাজূটে-শির ; ভুলি রত্নরাজি
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে, কবরী,
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে ;
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি'
গলদেশে ! প্রেম মন্ত্র দিয়ো কর্ণ-মূলে !
গুরুর দক্ষিণারূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম কুতূহলে !

লক্ষ্মণের জন্য সূর্পনখা সকল সুখ-সম্পদ-রিক্তা হইতেও কুণ্ঠিতা নহে।

সূর্পনখা রাজকুমারী—চিরকাল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতা পালিতা। তাই তাহার এইরূপ ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। সূর্পনখা আজীবন সৌভাগ্যে অভ্যস্থা—নৈরাশ্য কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। তাই তাহার এই পত্রিকাখানি আশার সফলতার আনন্দে পূর্ণ।—

ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে; আনন্দে বহিছে
অশ্রু ধারা !

২। প্রত্যাখ্যান-পত্র—প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য জাহ্নবী শান্তনুর নিকট যে পত্রিকাখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মহাভারতের আখ্যায়িকা লইয়া এই পত্রখানি রচিত।

রাজা শান্তনু, পত্নী জাহ্নবীর বিরহে রাজ্যধনে উদাসীন হইয়া গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিতেছিলেন। বিরহী রাজা শান্তনুকে উদ্দেশ্য করিয়া জাহ্নবী লিখিতেছেন।—

বৃথা তুমি নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি।

ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা অবসানে! এ চির-বিচ্ছেদে
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে।

জাহ্নবীর এই প্রত্যাখ্যান-পত্রিকাখানি গাম্ভীর্য্যে, মহত্ত্বে ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টিতে সেই গাম্ভীর্য্য মহত্ত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশিত।

যাও ফিরি', নরবর; আন গৃহে বরি'
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য সুখে।
পাল প্রজা; দম রিপু; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি' সৎক্রিয়া যতনে!
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি। প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী!
কি কাজ অধিক কয়ে? পূর্ব্বকথা ভুলি',
করি' ধৌত ভক্তিরসে কামগতঃ মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে রাজা! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্র-গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে!
যতদিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে!—
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যার দেবব্রত রথী!
লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি'
হস্তিনায়, হস্তিগতি! অন্তরীক্ষে থাকি'
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি!

৩। স্মরণার্থ-পত্রিকা ঃ—শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী ও দুঃশলার পত্র এই শ্রেণীর। এগুলি স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুলা বা স্বামীর অমঙ্গলচিন্তায় প্রোষিতভর্ত্তৃকার পত্র।

শকুন্তলা পত্রিকা ঃ—শকুন্তলা পত্রিকাখানির আদ্যোপান্ত বিরহিণী নারীর করুণ বিলাপ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। রাজা দুষ্মন্ত দুর্ব্বাশার অভিশাপে শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইয়াছেন। শকুন্তলা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। তাই তিনি রাজার প্রেরিত লোকজনের প্রতীক্ষমানা। পবন-স্বনন শুনিবামাত্র, অথবা ধূলারাশি দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তরে আশার সঞ্চার হয়, তিনি ভাবেন—ঐ বুঝি রাজ-অনুচরেরা তাঁহাকে লইতে আসিতেছে! এতদিনে বুঝি রাজা তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন।

ঋষি তনয়া শকুন্তলা ঐশ্বর্য্যের প্রত্যাশী নহেন। স্বামীসেবা করিতে পারিলেই তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন।—

জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্রসদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে।
কুলমানধনে তুমি রাজকুলপতি।
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ; সেবিব
দাসীভাবে পা-দুখানি—এই লোভ মনে,—
এই চির আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে।
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন ; কি কাজ প্রভু, রাজসুখ ভোগে ?

*   *   *   *

কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে

এই পত্রিকায় শকুন্তলার বিরহিণী রূপটি, তাঁহার উৎকণ্ঠা, তাঁহার অনুযোগ, তাঁহার সরলা মূর্ত্তিটি কবিত্বমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্রৌপদী পত্রিকা ঃ—দ্রৌপদী পত্রিকাতে শকুন্তলা পত্রিকার ন্যায় বিরহিণী রমণীর অন্তর্বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। এই উভয় পত্রিকার বিষয়বস্তু বিরহ হইলেও, পত্রিকা দুইখানির বিশেষত্বও সুস্পষ্ট। শকুন্তলা বিরহিণী—রাজা দুষ্মন্তের বিরহে তিনি কাতরা। দুষ্মন্তের অদর্শনে তিনি অধীরা, দুষ্মন্তের সহিত মিলনের জন্য তিনি ব্যাকুল। তাঁহার পত্রের ছত্রে ছত্রে সেই ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি সরলা ঋষিবালিকা। তাই তাঁহার পত্রে শুধু বিরহিণীর অন্তর্বেদনাই প্রকাশ পাইয়াছে, উহাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের লেশমাত্র নাই। রাজার কাছে তাঁহার প্রার্থনা—

আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে !—
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !

যাঁহার পিতার শিক্ষা "কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে"—তিনি ইহা ভিন্ন আর কি প্রার্থনা করিবেন !

কিন্তু পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য ত্রিদশালয়ে গমন করিলে পর বিরহ-বিধুরা দ্রৌপদী তাঁহাকে যে পত্রিকা লিখিয়াছিলেন তাহাতে দ্রৌপদীর আশঙ্কা এবং ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া পত্রখানিকে অন্য আর একরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

স্বর্গে ইন্দ্রালয়ে তিনি ইন্দ্রের প্রিয় অতিথি, সেখানে ভোগ-সুখের অভাব নাই। প্রলোভনের সামগ্রীও সেখানে অনেক। এই সকল কথা ভাবিয়া এবং স্বামীর বহুপত্নীত্বের কথা স্মরণ করিয়া বিরহিণী দ্রৌপদীর স্বভাবতই মনে হইয়াছে—.

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ সংসার আর ? কেন বা পড়িবে ?
কি অভাব তব কান্ত, বৈজয়ন্ত ধামে ?

দেবভোগ ভোগী তুমি, দেবসভা-মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—

* * *

কেহ গায় সুখে,
কেহ নাচে, দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে!
কস্তুরী-কেশর-ফুল আনে কেহ সাধে!
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি!
রসিক নাগর তুমি; নিত্য রসবতী
সুরবালা; শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা?

দ্রৌপদী নিজেকে কমলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার বহুস্বামীত্বের সুন্দর ইঙ্গিত করিয়াছেন।—

রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী;
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য কথা!—অবিরল লুটে
পরিমল! শিলীমুখ, গুঞ্জরি' সতত,
(কি লজ্জা!) অধর-মধু পান করে সে সুখে!
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে
সেই নিদারুণ বিধি!

এই পত্রিকায় দেখি যে অন্যান্য পাণ্ডবাপেক্ষা দ্রৌপদী অর্জ্জুনের প্রতিই সমধিক অনুরাগিণী ছিলেন। পত্রিকাখানি ভাবাবেগে পূর্ণ—ভাবাবেগে বিহ্বলা হইয়া দ্রৌপদী তাঁহার বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বহু ঘটনা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দ্রৌপদীর পূর্ব্বরাগও পত্রিকাখানির মধ্যে চমৎকার ফুটিয়াছে।

ভানুমতী-পত্রিকা ঃ—কুরুরাজ দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে লিপ্ত থাকার সময়ে কুরুকুলবধূ ভানুমতী যুদ্ধের সংবাদ নিয়ত শ্রবণ করিয়া অধীরা হইয়া উঠিয়াছেন। ব্যাকুলা হইয়া, স্বামীর অমঙ্গলচিন্তায় কাতর হইয়া তিনি দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়া পত্র প্রেরণ করিতেছেন। পত্রের মধ্যে পাণ্ডবদিগের নানা সদ্‌গুণও বর্ণিত হইয়াছে।

স্বামীর অমঙ্গলচিন্তায় ভানুমতীর চঞ্চলতা কবি নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।—

> কভু যাই দেবালয়ে, কভু রাজোদ্যানে ;
> কভু গৃহচূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া—
> রণস্থল। রেণুরাশি গগন আবরে—
> ঘন ঘন জালে যেন ; জ্বলে শররাশি,
> বিজলীর ঝলাসম ঝলসি নয়নে !

ভানুমতীর ন্যায় দুঃশলাও তাঁহার স্বামী জয়দ্রথের কল্যাণচিন্তায় ব্যাকুলা হইয়া তাঁহার পত্রিকাখানি রচনা করিয়াছেন। পত্রিকার মধ্যে যেখানে অর্জ্জুনের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে, উহা মধুসূদনের বীররসবর্ণনশক্তির অতুলনীয় নিদর্শন।

৪। অনুযোগ-পত্র—কৈকেয়ী ও জনার পত্র। এই দুইখানি পত্র স্বামীর ব্যবহারে পীড়িতা মুখরা নারীর পত্র। পত্র দুখানি যে সমগ্র বীরাঙ্গনাকাব্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট একথা বলা চলে। দুঃখ, ব্যঙ্গ, তিরস্কার সম্মিলিত হইয়া পত্রিকা দুইখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। কৈকেয়ী এবং জনা উভয়েই স্বামীর ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পত্র দুইখানির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। কৈকেয়ীর পত্র নারী-জনোচিত অভিমানে পরিপূর্ণ, জনার পত্রিকা বীরত্বাভিমানে পরিপূর্ণ।

নীলধ্বজের প্রতি জনা—মধুসূদনের জনা তাঁহার মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রমীলা চরিত্রের মতই বঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। জনার পত্রিকাখানিতে নারীহৃদয়ের ক্ষাত্র তেজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। জনা বীরাঙ্গনা—বীরের জননী। একমাত্র প্রিয়পুত্র মহাবীর প্রবীরকে তিনি স্বহস্তে সজ্জিত করিয়া সমরক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন। বীর জননীর বীরপুত্র মহাবিক্রমে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়া সমরাঙ্গণে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। পুত্রশোকের সেই নিদারুণ শেলাঘাতে জননী-হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, তিনি সাধারণ নারীর ন্যায় অভিভূতা হইয়া পড়েন নাই। পুত্রের বীরত্ব-গৌরবে তাঁহার চিত্ত গৌরবান্বিত ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রহারা হইয়া তিনি যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া বীরাঙ্গনার প্রতিহিংসানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিশোধ লইবার বাসনায় বড় আশা করিয়া জনা তাঁহার পতির উদ্দেশে ধাবিতা হইয়াছিলেন। প্রাসাদ-সন্নিকটে উৎসবায়োজন দেখিয়া তাঁহার মন আশায় উৎসাহে উদ্বেল হইয়া উঠিল। ভাবিলেন,—

> সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
> প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে—
> নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে ?
> এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
> মহাবাহু! যাও বেগে, গজরাজ যথা,
> যমদণ্ড-সম শুণ্ড আস্ফালি' নিনাদে!
> টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
> খণ্ড মুণ্ড তার আন শূলদণ্ডশিরে!
> অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে;
> নাশ, মহেষ্বাস, তারে! ভুলিব এ জ্বালা,—
> এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে!
> জন্মে মৃত্যু—বিধাতার এ বিধি জগতে।

ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ সমরে পড়ি', গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।

বীরাঙ্গনা জনা এইরূপে তাঁহার পতি নীলধ্বজের অন্তরে প্রতি-হিংসানল জ্বালাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, স্বীয় পতির অন্তরে ক্ষাত্রতেজ উদ্দীপিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজসভায় প্রবেশ করিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশান্বিতা বীরাঙ্গনা নিরাশ হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, রাজসিংহাসনে তাঁহার পুত্রহন্তা পার্থ উপবিষ্ট, নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীতের দ্বারা পার্থের মনোরঞ্জনে রত,—স্বামী নীলধ্বজ নতমস্তকে পার্থের চরণসেবা করিতেছেন। ইহাতে ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় বীরাঙ্গনার অন্তর পরিপূরিত হইয়া গেল। তিনি কুপিতা ফণিনীর ন্যায় বলিলেন—

তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসেছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে।
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায় কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি, হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?

* * *

কেমনে তুমি, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম এই কি নৃমণি?

জনা যখন তাঁহার জ্বালাময়ী বাক্যের দ্বারাও নীলধ্বজের মধ্যে ক্ষাত্রতেজ অথবা প্রতিহিংসানল কিছুই উদ্দীপিত করিতে সমর্থ

হইলেন না, তখন তিনি অর্জ্জুনের অন্যায় যুদ্ধ এবং চরিত্রের দুর্ব্বলতার কথা স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া পুত্রের মৃত্যুর প্রতিহিংসা লইতে বলিলেন। কিন্তু নীলধ্বজ তাহাতেও বিচলিত হইলেন না দেখিয়া পুত্রহারা জনার নিকট পৃথিবী শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। প্রতিহিংসাময়ী ক্ষত্রিয় নারী যখন দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রহন্তা স্বামীর রাজসভায় সম্মানিত,—অতিথিরূপে পূজিত, তখন সে অপমানভার তাঁহার অসহ্য মনে হইল। তখন—

মহাযাত্রা করি,
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে।

জনায় নারীর সুকোমল ললনা-সুলভ বৃত্তির সহিত স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত তেজস্বিতার সংমিশ্রণ করিয়া মধুসূদন এক অনিন্দ্যসুন্দর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কাব্যাংশের প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে জনার স্নেহ—তাঁহার স্বামীভক্তি। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে এ সকলই বাহ্যিক আবরণ, কাঠামোর উপরিস্থিত খড়, কাদামাটি ; আসল কাঠামো হইতেছে তাঁহার প্রবল আত্মমর্য্যাদা-বোধ, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই জনার অন্যান্য সকল গুণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র পুত্র অসীম সাহসী প্রবীর ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদারক্ষার্থে অসমযুদ্ধে রণক্ষেত্রে মহানিদ্রায় শায়িত হইল বলিয়াই জনার নিকট তাহা এত আদরণীয়, এত প্রিয়! সন্তান-বিলোপ কি মাতার হৃদয়ে শেল-সম কঠোর আঘাত করে না? নিশ্চিত করে। কিন্তু এইরূপ অবস্থাতে অশান্ত নারী-চিত্তও সংযত হইতে পারে, যদি তাহা পরিচালিত হয় আত্মসম্মানের মহৎ আদর্শ দ্বারা। জনার চরিত্রের মহত্ত্ব এইখানেই। জনার নারী-চরিত্র যে কতদূর মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, যখন আমরা লক্ষ্য করি যে একমাত্র প্রিয়পুত্রের বিনাশ

তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাহা শ্রবণ করিয়া সহ্যও করিয়াছেন।

ক্ষত্রিয় রমণী জনার চরিত্র-মাহাত্ম্য কেবল পুত্রের মৃত্যু-শোক সংবরণের উপরই প্রতিষ্ঠিত নয়, ক্ষাত্রধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে তিনি বল্লভ-হীনা হইতেও প্রস্তুত।

জনা নিশ্চিতরূপে জানেন অজেয় পার্থের বিরুদ্ধে ভুজ-বলের সাধনা মত্ত মাতঙ্গের বিরুদ্ধে সদ্য স্ফুটদন্ত শিশুর যুদ্ধের ন্যায় নিরর্থক। কিন্তু তিনি যে ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না যে, তিনি ক্ষত্রিয়বালা, ক্ষত্রিয় স্ত্রী, ক্ষত্রিয় মাতা—তিনি যে এক মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিতা! ক্ষাত্র-ধর্ম্মোচিত বীরত্বে আজ তাঁহার শিরায় শিরায় প্রতিহিংসার করাল-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। মর্য্যাদাহানিকর ফাল্গুনীর প্রতি চিত্ত তাঁহার আজ বিষাক্ত, তিক্ত, প্রতিশোধ-পরায়ণ।

পুত্রহারা জনা আজ ভর্ত্তৃহীনা হইতেও বিমুখ নহেন। কি সুন্দর! কি মহৎ এই চিত্র! নারী জনার হৃদয়ে ক্ষাত্রধর্ম্মের আত্মমর্য্যাদার কি প্রশংসনীয় পরিণতি!

পুত্রহন্তা অর্জ্জুনের প্রতি শাস্তি প্রয়োগের জন্য তিনি স্বামী নীলধ্বজকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলেন, কাতর মিনতি করিলেন, উদ্দীপনাময়ী কথাও কহিলেন, এবং অবশেষে তিরস্কার পর্য্যন্তও করিলেন; কিন্তু হায়! সকলই বিফলে গেল! নীলধ্বজের অন্তরে কিছুই প্রবেশ করিল না। তিনি কৌন্তেয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইতে স্পষ্টতই অস্বীকার করিলেন। কঠোর নীলধ্বজের যুদ্ধে অনিচ্ছা জনার হৃদয়ে ভীষণ আঘাত করিল। পুত্রশোকেও যে হৃদয় বিহ্বল হয় নাই, স্বামী কর্ত্তৃক আদর্শপুত্রের আদর্শ অবহেলায় তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গাই রহিল, আর জোড়া লাগিল না।

আত্মমর্য্যাদার মধ্য দিয়াই জনার চরিত্র স্বগায় অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

জনার সকাতর আহ্বান, তেজস্বিতাপূর্ণ উক্তি, উত্তেজনাময়ী বাক্য—সকলই অসার প্রতিপন্ন হইল। নীলধ্বজ অচলের ন্যায়ই অচল রহিলেন। বধিরের ন্যায় তিনি পতি-গতপ্রাণা সাধ্বীর কোনও কথায় সাড়া দিলেন না। পুত্রহীনা জনার একমাত্র গতি ছিলেন পতি। কিন্তু তিনিও যখন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন ঐহিক জীবনে জনার আর কোনও আসক্তি রহিল না। তাই সকল জ্বালা নিরসন-মানসে পূত-সলিলা জাহ্নবীবক্ষে জীবনের অবসান করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্পা হইলেন।

কবি মধুসূদন রচিত জনার চরিত্র ট্র্যাজিক। কারণ, এখানে ব্যক্তিগত সত্তা যাহা চাহিয়াছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছে। চরিত্রের নিশ্চল দৃঢ়তায়, নারীত্বের অপার মহিমায়, ধনে, জনে, মানে—জনার মহীয়সী নারী চরিত্রটি বিশাল বনস্পতির ন্যায় সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু জনার এই যে জীবনের অপমান—নারীত্বের অপমান—আদর্শের অপমান, আত্মমর্য্যাদার হানি,—ইহার বেদনাই তাঁহার চরিত্রের মূলীভূত ট্র্যাজেডি। জনার অন্তরের মহৎ আদর্শ বাহিরের নিষ্করুণ আঘাতে বিশুষ্ক হইয়া এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতির সামান্য ক্রীড়নকরূপে যেদিন জনা নিজেকে আবিষ্কার করিলেন, সেদিন হইতে জীবনের প্রতি তাঁহার আর কোনও আকর্ষণ থাকিল না। এমতাবস্থায়ই তিনি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। জনার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুটাই ট্র্যাজেডির উপকরণ নহে। যে শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া তিনি মৃত্যুকে বরণ করিলেন, তাহাই জনার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

বীরাঙ্গনা কাব্যখানিতে একাধিক নায়িকা এক শ্রেণীর পত্র রচনা করিলেও কোনো দুইখানি পত্র একরকম হয় নাই। সমজাতীয়া

চরিত্রের মধ্যেও ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব ফুটাইয়া মধুসূদন কৃতিত্ব ও কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

এই কাব্যের মধ্য দিয়াই বঙ্গসাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক প্রেমের আদর্শ প্রবেশ করিয়াছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের আধারেও যে লিরিক ভাব প্রকাশ পাইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই বীরাঙ্গনা কাব্যে। গ্রীক দার্শনিকগণ কাব্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—এপিক, লিরিক ও নাটক। কাব্যের এই তিনটি রূপই যে এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাহায্যে রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন মাইকেল মধুসূদন। অমিত্রছন্দে নাটক রচনার সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিকে তিনি সুস্পষ্ট-ভাবে দেখাইয়াছিলেন 'পদ্মাবতী নাটক' রচনা করিয়া। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে একবার তিনি এপিক রচনা করিলেন, পুনরায় ইহারই সাহায্যে লিরিক ভাব অভিব্যক্ত হইল বীরাঙ্গনায়।

অমিত্রছন্দকে বাহন করিয়া বিচিত্র ও বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা যে সম্ভব তাহা উপলব্ধি করিয়া জনৈক ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন—

"The Blank-Verse is a noble vehicle for the Epic. It can tell a story ; it can voice a purely lyric sentiment; it can convey the interpenetrative description of external nature or the subtlest revelation of human psychology. It can serve alike the witty banter of light comedy and for the soul-stirring depths of inexorable tragedy."

—এই উক্তির যথার্থতা মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। মেঘনাদবধের Epic Grandeur বা মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্য আমাদিগকে যেমন বিস্মিত করিয়াছে; 'বীরাঙ্গনা'র ছন্দের অপূর্ব্ব বর্ণবিন্যাস তেমনিই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অপর বৈশিষ্ট্য গাম্ভীর্য্য ও কোমলতার সংমিশ্রণ। শকুন্তলা প্রভৃতির করুণ-কোমলতা এবং জনা দ্রৌপদীর

তেজস্বিতা ও তিরস্কার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' একাধারে সম্মিলিত হইয়া কাব্যখানি বিচিত্রতার সম্পদ লাভ করিয়াছে। এক হিসাবে এই বীরাঙ্গনা কাব্যেই মধুসূদনের বহুমুখী প্রতিভা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত—মধুসূদনের উদ্ভাবিত ছন্দ এই কাব্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বীররসের সহিত, করুণরসের অপরূপ সমন্বয় ইহাতে ঘটিয়াছে। দক্ষশিল্পীর নিপুণ তুলিকায় প্রত্যেকটি চরিত্র-চিত্রণ স্বভাবানুযায়ী এবং প্রত্যেকটি নায়িকার স্বকীয় ভাবানুযায়ীই হইয়াছে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। ভাষা ছন্দ ও গঠনরীতি যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন সৃষ্টি। ভাবের দিক দিয়াও এই শ্রেণীর কবিতাগুলি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে নূতনত্বের সন্ধান দিয়াছিল। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মূলগত ভাব স্বদেশপ্রেম। প্রত্যেকটি কবিতার মধ্য দিয়া নিবিড় স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, এই ধরণের কবিতা বঙ্গসাহিত্যে ছিল না। মধুসূদনই এই শ্রেণীর কবিতা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তিনিই সনেট রচনার একটা আদর্শ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সনেটের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তিনি একটি সুস্পষ্ট সঙ্কেত রাখিয়া গিয়াছিলেন।

'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার প্রায় সমসাময়িক কালেই মধুসূদনের মনে বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর কবিতা প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষ জন্মে। ঐ সময়েই তিনি একদিন একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করেন এবং উহা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে লেখেন—

'I want to introduce the sonnet into our language and some mornings ago made the following :—

কবি মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য, তা সবে আমি অবহেলা করি',
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,

অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি',
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?

What say you to this, my good friend ? In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian."

এই কবিতাটিই পরিবর্ত্তিত রূপে পরে কবির চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

যে কবির সংস্কার ছিল যে বঙ্গভাষা বর্ব্বরের ভাষা, ইহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল; উত্তরকালে সেই কবিরই বঙ্গভাষার উপর এমন অধিকার জন্মিয়াছিল যে, সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন কিছু সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সেইজন্য সনেট রচনা করিবার যে আশা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা চরিতার্থ করিয়া তবে ছাড়িয়াছিলেন। কাব্যসাহিত্যে সনেটের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশেষ প্রাপ্তি। মধুসূদনেরই সমসূত্রে পরবর্ত্তীকালে বঙ্গসাহিত্যে বহু উৎকৃষ্ট সনেট রচিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণের সনেটজাতীয় কবিতায় বঙ্গসাহিত্য আজ সুসমৃদ্ধ।

সনেটের ছন্দ ও মিল-বিন্যাসে কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। সনেট জাতীয় কবিতার সৌন্দর্য্য ইহার বিশিষ্ট ছন্দে ও মিলবিন্যাসে। সনেটের ছন্দ, মিলবিন্যাস ও গঠনের মধ্য দিয়া এক অতি অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। এই জিনিসটিই খুব সম্ভবতঃ

মধুসূদনকে সনেট রচনার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি খুবই সফলতার সহিত বঙ্গসাহিত্যে সনেটের ছন্দ এবং মিলবিন্যাসের রীতি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এজন্য বঙ্গসাহিত্য চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে।

ইউরোপ প্রবাসকালে মধুসূদন যখন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি তিনি রচনা করেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতার সমস্তগুলিই তিনি বিদেশে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন। এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীই বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের শেষ অর্ঘ্য। ইহার পরে কবি আর কোনও উল্লেখযোগ্য রচনা করেন নাই।

সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা ইউরোপের Renaissance-এর যুগে ইটালীতে সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্য উহা ইটালী হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাসমূহও ইটালীর কবি পেতরার্কের আদর্শে রচিত। এ সম্বন্ধে তিনি গৌরদাস বসাককে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"I have lately been reading Petrarcha the Italian poet, and scribbling some sonnets after his manner."

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর প্রারম্ভেই একটি কবিতায় ইটালীর কবি পেতরার্কের প্রতি মধুসূদন তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।—

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাক্‌দেবীর বরে

বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাসে গ্রহিলা জননি
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে।

আদি সনেট প্রেমের আবেগে উৎসারিত হইয়াছিল। প্রেমই ছিল সনেট জাতীয় কবিতার বিষয়বস্তু। ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্যের উৎকৃষ্ট সনেটগুলি অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, হয় প্রেম নতুবা একটি খুব গভীর আবেগ এবং অনুভূতি অভিব্যক্ত হইয়া সনেট-জাতীয় কবিতাকে প্রাণময়ী করিয়া তুলিয়াছে। ইহাই সনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এ সম্পর্কে Sir Arthur Quiller Couch-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। Quiller Couch বলেন—

"In substance it (Sonnet) is a reflective poem on love, or at least some mood of love. It has a unity of its own and must be the expression of a single thought or feeling"

সনেটজাতীয় কবিতা কবি-হৃদয়ের আলেখ্যস্বরূপ। ইহার মধ্য দিয়া কবির অন্তরের একটি গভীর আবেগ বা Sentiment প্রকাশিত হয়। সুতরাং কবির অন্তরের নিবিড় পরিচয় লাভ করা যায় সনেটের মধ্য দিয়া। সনেট জাতীয় কবিতা যে কবির ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও মনোভাব প্রকাশের উপযোগী মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' তাহার প্রমাণ দিতেছে।

মধুসূদনের হৃদয়ের পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিতে হইবে। কারণ এই সকল কবিতায় কবির

অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ব্যক্তিগত ভাকাবেগ উৎসারিত হইয়াছে। বাংলার প্রত্যেক বস্তুর প্রতি কবির আকর্ষণ, অনুরাগ ও সহানুভূতি চতুর্দ্দশপদী কবিতার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত। সুদূর প্রবাসে বসিয়া স্বদেশের ছোটখাট তুচ্ছতম ব্যাপারটি পর্য্যন্ত কবিচিত্তে আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছে। বাংলার যাবতীয় সাধারণ জিনিস কবির কাছে অসাধারণ মাধুর্য্যমণ্ডিত বলিয়া মনে হইয়াছে। ভারতের কবি, দেবদেবী ও অন্যান্য বহু ঘটনা ও বস্তুর প্রতি কবি তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্য দিয়া অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলার পূজা-পার্ব্বণ, শ্যামা জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা, 'বউ কথা কও' পাখীর কথা, শ্রীমন্তের টোপর, ঈশ্বরী পাটনীর কথা প্রভৃতি যাহা কিছু বাংলার—সে সকল জিনিসই তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইয়াছে। স্বদেশপ্রীতি, বঙ্গভাষার প্রশস্তিগান,—জয়দেব, কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পূর্ব্বকবিগণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনই মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতার মর্ম্মকথা।

কবির স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিবৎসলতা এই সকল চতুর্দ্দশপদী কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না আশা-আনন্দই তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতার বর্ণনীয় বিষয়। আশ্বিনে উমার আগমনে বাঙ্গালীর প্রাণে যে আশা-আনন্দ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে তাহাকে ভাষা দিয়াছেন মধুকবি। বিজয়া দশমীর সকরুণ চিত্র স্মরণ করিয়া কবির অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—

"যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে;
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—

তিনটি দিনেতে, কহ লো, তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ জ্বালা এ মন জুড়াবে ?
তিন দিন স্বর্ণ দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি' অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি !"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা শেষে গিরীশের রাণী।

কবি যেন এই কবিতাটির মধ্য দিয়া বাঙ্গালী-ভক্তের অন্তরের কথাকে ভাষা দিয়াছেন—ইহা বাঙ্গালী ভক্তের বাৎসল্যরসের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। বাঙ্গালী জগদম্বাকে কেবল জননীরূপে পূজা করে নাই, একেবারে কন্যাস্নেহে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছে। সেই আন্তরিক ভালবাসা—সেই বাৎসল্যরস মধুকবির অন্তর হইতেও উৎসারিত হইয়াছে।

যৌবনে যে কবি বিজাতীয় আদর্শে প্রাণে-মনে দীক্ষিত হইবার জন্য লালায়িত ছিলেন, সেই কবি শ্রীপঞ্চমীর উৎসব স্মরণ করিয়া গাহিয়াছেন—

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে ;—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে !
মনোরূপ পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে !
কবির হৃদয় বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙ্গা চরণে

পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি মা পাইবে !
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ?

স্বদেশপ্রেমিক কবি বাংলার ধূলিকণাতে পর্য্যন্ত বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন। বাংলা হইতে বিদায় লইতে গিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।

বিদেশে গিয়াও এই স্বদেশপ্রীতির এতটুকু হ্রাস তাঁহার হয় নাই। সেখানে বসিয়াও তাঁহার মনে পড়িয়াছে জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা, সেখানে বসিয়া বাংলার দৃশ্য কবির কাছে মধুবৎ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাঁহার স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিয়াছে বাংলারই পূজা-পার্ব্বণ ও কবিদিগের কথা। ফরাসী মহিলার নিকটে কবি পত্র লিখিতেছেন তাহাতেও স্বীয় জননী জন্মভূমির কথা—

যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত-কাননে ;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে,
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে।

এইরূপ স্বদেশবৎসলতা চতুর্দ্দশপদী কবিতায় সর্ব্বত্রই অনুভূত হইবে। এক কথায় 'স্বদেশপ্রীতি'-কেই চতুর্দ্দশপদী কবিতার মূল সুর বলা যাইতে পারে। মাতৃভূমির ঐশ্বর্য্য কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে,—স্বদেশের দৈন্য ও দারিদ্র্য কবিকে ব্যথিত করিয়াছে।

বঙ্গবাণীর প্রতি,—ভারতীয় কবিদিগের প্রতি—বিশেষ করিয়া বাংলার কবি কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস—যাঁহারা কবির কল্পনাশক্তি ও

কবিত্বশক্তিকে উৎসারিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কবির যে অসীম শ্রদ্ধা তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে এই চতুর্দ্দশপদী কবিতায়। মাতৃভাষাকে তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ভালবাসিতেন! বিদেশী ভাষায় অসীম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া শেষে তিনি গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন—

জানিলাম কালে
মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।

'সমাপ্ত' নামক কবিতাতেও বাঙ্গালা ভাষার সেবা সময়ে না করার জন্য কবির অনুশোচনা প্রকাশ পাইয়াছে এবং বঙ্গবাণীর পূজাশেষে বর প্রার্থনাকালে বাণীর বরপুত্র কামনা করিয়াছেন—

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে।

বঙ্গের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিবার জন্য তিনি কত উৎসুক ছিলেন তাহা এই সামান্য দুই পংক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতার মধ্যে যেন ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশ সুস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত ছিল। কারণ, এই সূত্রে বঙ্গসাহিত্যে Subjective কল্পনাদর্শ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এখানে কবি ইতিহাস পুরাণ হইতে রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনায় কবি নিজের অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করিয়া সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে কবির নিজের অনুভূতি ছন্দে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর কবিতাসমূহে কবির ভাবাবেগ তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। Subjective বা স্বানুভাবাত্মক কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাও মধুসূদনের সনেট রচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী উত্তরকালের Subjective কবিতার অগ্রদূত।

পাশ্চাত্য প্রভাব

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই নবযুগের উন্মেষে পাশ্চাত্য সাহিত্যই যে সহায়তা করিয়াছে, প্রেরণা জোগাইয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে গড়িয়া উঠিয়া বিশ্বসাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। এ যুগের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সুর, ছন্দ, ভাব, কল্পনাদর্শ ও বিচিত্র রূপসৃষ্টির (Form) অসীম প্রভাব রহিয়াছে। কি কাব্য-সাহিত্য, কি গদ্যসাহিত্য, কি নাট্যসাহিত্য—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোনও বিভাগই পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব এড়াইয়া চলিতে পারে নাই।

বাংলার আধুনিক যুগের কবিগণের ভাব ও কল্পনাদর্শের মূলে পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্য নানাদিক দিয়া নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে যে অমিত প্রতিভাশালী কবির কাব্যের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের স্রোত সর্ব্বপ্রথম সচেতনভাবে প্রবেশ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়াছিল, তিনি মাইকেল মধুসূদন। মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার কবিবীণায় আধুনিক আদর্শের সঙ্গীতধ্বনি তুলিয়া পাশ্চাত্য কাব্যরসপিপাসু বাঙ্গালী পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তে এবং রঙ্গলালে পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল সত্য। কিন্তু ঐ দুই কবি একেবারে সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। পাশ্চাত্য প্রভাব থাকা সত্ত্বেও

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ভারতচন্দ্রীয় যুগের প্রভাব ছিল,—সেই যুগের যমকানুপ্রাসের প্রাচুর্য্য এবং অশ্লীলতা দোষ তাঁহার কবিতাসমূহকে সম্পূর্ণভাবে মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের প্রভাবমুক্ত করিতে পারে নাই। রঙ্গলালের কাব্যসমূহেও মঙ্গলকাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু মধুসূদন বিদেশী সাহিত্য হইতে আখ্যায়িকা, ভাব, কল্পনাদর্শ, উপমা, ছন্দ ইত্যাদি—কাব্যরচনার যাবতীয় আদর্শ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নূতন আকর্ষণী শক্তি সঞ্চার করেন। এইসব উপকরণ বিদেশী বলিয়া খাঁটি বাঙ্গালীগণের মনোহরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু যে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গসাহিত্যের দৈন্য দেখিয়া হতাশ হইয়া যাইতেছিলেন, মধুসূদনের সাহিত্য-সৃষ্টিতে সকলের অন্তরে আশার সঞ্চার হইল। মধুসূদনের কাব্যসাহিত্য এই শ্রেণীর পাঠক-বর্গের চিত্তকে অনতিকালের মধ্যে জয় করিয়াছিল।

শিক্ষার মধ্য দিয়া মধুসূদনের হৃদয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করিয়া তুলিয়া—বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। যৌবনে হিন্দু-কলেজে—বিশেষতঃ বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের রস ভাল করিয়া আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য কাব্যরসের সহিত পরিচয় লাভই তাঁহার অন্তরে কবি হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল—পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের অভ্যন্তরে যে ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি ও কলানৈপুণ্য আছে, বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে প্রবর্ত্তিত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল। যৌবনে পঠদ্দশাতেই বায়রণ তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতেন, মিলটন, হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসোর কাব্যানুশীলন তাঁহার কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়াছিল—তাঁহার সৃজনী-প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কবি কীট্‌সের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল! কীট্‌সের সেই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

মধুসূদনের ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে’ অভিব্যক্ত। শেলী, সেক্‌সপীয়ারের প্রভাবও তাহার কাব্যে রহিয়াছে।

সুতরাং মধুসূদন একদিকে ভারতীয় সাহিত্যের বাল্মীকি, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস—অপরদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিল্‌টন, বায়রণ, কীট্‌স, শেলী প্রভৃতির নিকট হইতে কাব্যমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে শেলী, বায়রণ, কীট্‌স—এই তিনজন রোমান্টিক কবির প্রভাব অপেক্ষা হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিল্‌টন এই কয়জন ক্লাসিক কবির প্রভাবই মধুসূদনের কাব্যসমূহে অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। রোমান্টিক কবি শেলী এবং কীট্‌সের প্রভাব ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে’র মধ্যে মধুসূদনের কবিদৃষ্টি ও কল্পনা-ভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের রেমোন্টিক রিভাইভ্যালের উত্তরকালে জন্মগ্রহণ করিয়াও মধুসূদন ছিলেন প্রাণে-মনে ক্লাসিক আদর্শের পক্ষপাতী। তাই তিনি কাব্যসৃষ্টিতে রোমান্টিক আদর্শ অপেক্ষা প্রাচীন ক্লাসিক আদর্শের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিলেন।

মধুসূদন বাংলা কাব্যসাহিত্যে পাশ্চাত্য কাব্যের ঐশ্বর্য্য সম্পাদন করিয়া—মধুলোভাতুর মক্ষিকার ন্যায় নানাদেশীয় কাব্যকুসুম হইতে মধু আহরণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিয়া গেলেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সম্মিলনেই বাংলার ভাবীকালের সাহিত্য গঠিত হইবে, এবং তবেই তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আসন পাইবার যোগ্য হইবে। তাঁহার কাব্যে মিল্‌টনের কাব্যের ছন্দৈশ্বর্য্য ও ভাবসম্পদ বর্ত্তমান, তাঁহার কাব্যে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো প্রভৃতি ইউরোপীয় ক্লাসিক কবিদিগের ভাবৈশ্বর্য্য ও রচনারীতির প্রভাব অনুভূত হয়। মধুসূদনের কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারার উপর, তাঁহার কল্পনাদর্শের উপর উল্লিখিত ক্লাসিক

কবিদিগের আদর্শ ও রোমান্টিক্ কবি শেলী, বায়রণ, কীট্‌সের প্রভাব যুগপৎ কার্য্য করিয়াছে। ইহাতে তাঁহার কাব্য বিচিত্রতার সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। শেলী, কীট্‌সের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব মধুসূদনের 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে' এক অপূর্ব্ব নবীনতা ও সাহিত্যশ্রী আনিয়া দিয়াছে।

কবি স্বদেশের পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল কাব্যের ভিতর দিয়া কবির সৃজনীপ্রতিভা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে—পাশ্চাত্য প্রভাব কার্য্যকরী হইয়া কবির সেই সকল কাব্যকে অভিনব রূপে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে।

মধুসূদনেরই প্রবর্ত্তিত আদর্শ অনুসারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবের সম্মিলনে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য গঠিত হইল। তাঁহারই প্রতিভাগুণে ভারতীয় কবিদিগের মাধুর্য্য এবং কোমলতার সহিত পাশ্চাত্য কবিদিগের বিচিত্রতা এবং ওজস্বিতা মিলিত হইয়া বাংলা সাহিত্য অপূর্ব্ব ভাবসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠিল—বাংলা কাব্যসাহিত্য এক নূতন পথে জয়যাত্রা করিল।

মধুসূদনের কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবরাশির অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে দেখিতে পাই। কবি যদিও দেশবিদেশের 'কবি-চিত্ত-ফুলবন-মধু' লইয়া তাঁহার কাব্যসমূহের সৌন্দর্য্য-সাধন করিয়াছেন; কিন্তু বিভিন্ন কবির ভাব চরিত্র ও কল্পনাভঙ্গি মধুসূদন তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন নববেশে সুসজ্জিত করিয়া। সুবিখ্যাত কবি-সমালোচক Stopford Brooke মধুসূদনের কবিগুরু মিল্‌টন সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা মিল্‌টনের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

Stopford Brooke বলিয়াছেন—

Milton was a scholar, and in his writings we continually find echoes of what we fancy we have heard before. But

the alchemy of his genius turns the ore of his predecessors into pure gold ; he borrows but to improve and give it back as his own. It little matters where this and that came from ; the poem, as we have it, is in Milton's in every line ; in thought, in style, in build, in imaginative and moral power.

মিল্‌টনের মতই মধুস্দনের প্রতিভার অলোকসামান্ত আলোক-সম্পাতে বিবিধ কবির ভাব, কল্পনাভঙ্গি, রূপসৃষ্টির আদর্শ, ছন্দ প্রভৃতি মধুকবির কাব্যে অপরূপ ভাবে রূপান্তরিত ও রূপায়িত হইয়াছে। মনীষী রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—ইঁহারা মধুসূদনের প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape.

একথা খুব সত্য।

মধুসূদনের প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভব। এই কাব্যে শেলী, কীট্‌স, মিল্‌টন ও কালিদাসের প্রভাব রহিয়াছে। শেলী, কীট্‌সের মতই কবি তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' বস্তু-নিরপেক্ষ, রূপাতীত —Absolute, Abstract সৌন্দর্য্যের স্তুতিগান করিয়াছেন। এই কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইংলণ্ডের সমুদ্রচ্ছন্দা কবি মিল্‌টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের Blank Verse-এর আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছিল।

মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' রোমান্টিক কবি শেলী, কীট্‌সের কল্পনাভঙ্গি বর্ত্তমান; আর তাঁহার মেঘনাদবধে হোমার, মিল্‌টন, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো প্রভৃতি ক্লাসিক কবিদিগের প্রভাব রহিয়াছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে মধুসূদন একখানি চিঠি লিখিতেছেন—সেই পত্রখানি 'মেঘনাদবধ

কাব্যে'র উপরে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। কবি লিখিতেছেন—

I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation) Tasso (do) and Milton. These কবিকুলগুরুs ought to make a fellow a first rate poet if nature has been gracious to him.

মেঘনাদবধ কাব্যের রচনারীতি-বিষয়ে (form) বাল্মীকি, মিল্‌টন এবং হোমারই কবির উপর সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক পৌরাণিক আখ্যায়িকা কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল; সেই হেতু তিনি গ্রীক পৌরাণিক আখ্যায়িকা সকল কৌশলে এই কাব্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রীক রচনাদর্শ অনুযায়ী মেঘনাদবধ কাব্যখানি রচনা করিতে গিয়া কবি মধুসূদন দেবতাদিগকে যুধ্যমান পক্ষে যোগদান করাইয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের দেবতাগণ গ্রীক আদর্শে গঠিত হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের রচনাদর্শ বিষয়সজ্জা প্রভৃতির উপর এমনিতর গ্রীক প্রভাব অনেক স্থলেই অনুভূত হয়।

একদিকে যেমন গ্রীক প্রভাব এই কাব্যখানিকে রূপ দান করিয়াছে, অপরদিকে মিল্‌টনের প্রভাব এই কাব্যখানিকে অপরূপ মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছে। এক হিসাবে বলিতে গেলে গ্রীক প্রভাব অপেক্ষা মিল্‌টনের প্রভাব মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় মধুসূদনের উপর বেশী ছিল।

রামায়ণের কাহিনী লইয়া রচিত হইলেও—মহাকবি বাল্মীকি আর কৃত্তিবাসের প্রতি কবি তাঁহার কাব্যের মূল সুরের জন্য ঋণী হইলেও—মিল্‌টন, হোমার, ভার্জিল, দান্তে এবং ট্যাসোর প্রতি কবি অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। মিল্‌টনের প্যারাডাইস্‌ লষ্ট্‌, হোমারের 'ইলিয়াড্‌', ভার্জিলের 'ইনিড্‌', দান্তের 'ডিভাইন কমেডি', ট্যাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড'—প্রভৃতি বিভিন্ন পাশ্চাত্য কাব্যের ঘটনা ও ভাবরাশি পরিবর্ত্তিত হইয়া মেঘনাদবধের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রথম সর্গে গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি হোমার, মিল্‌টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদিগের আদর্শে কল্পনাদেবীর বা ইউরোপীয় কাব্যের Muse-এর বন্দনা করিয়াছেন। কবির "কহ হে দেবি! অমৃত ভাষিণি!"—অথবা "তুমিও আইস, দেবি! তুমি মধুকরী কল্পনা!" —এই সকল অংশ আমাদিগকে মিল্‌টনের প্যারাডাইস্‌ লষ্টের— "Sing Heavenly Muse", এবং ইলিয়াড্‌ কাব্যের "Heavenly Goddess Sing" প্রভৃতি অংশ স্মরণ করাইয়া দেয়। কি তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে, কি মেঘনাদবধ কাব্যে—উভয় ক্ষেত্রেই কবি শুধুমাত্র বাগ্‌দেবী বীণাপাণির বন্দনাগান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। ইউরোপীয় কবিগণের আদর্শে কল্পনা দেবীর বন্দনাও করিয়াছেন। মধুসূদন এই কল্পনা দেবীর বা Muse-এর বন্দনায় মুখর। তিনি ইঁহাকে সরস্বতীর নিত্য-সহচরী বলিয়া মনে করেন। তাই দেখি 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে 'কল্পনা' শীর্ষক কবিতায় তিনি বলিতেছেন—

লও দাসে সঙ্গে সঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে!
বাগ্দেবীর প্রিয় সখি!

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীরই 'কবি' শীর্ষক একটি কবিতাতে কবি ইউরোপীয় কাব্যের Muse বা কল্পনাসুন্দরীর প্রতি তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন,—কল্পনাসুন্দরীই যে কবির ভাব এবং কল্পনা উৎসারিত করিয়া থাকেন একথা তিনি বলিয়াছেন।—

সেই কবি মোর মতে; কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন।

অতঃপর প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পর রাক্ষসগণ যখন যুদ্ধসজ্জা করিতেছিল, কবি তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে একটি দৃশ্যের অবতারণা করিয়া আপনার সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। দৃশ্যটি পাশ্চাত্য আদর্শে চিত্রিত। কিন্তু কবি-প্রতিভার আলোকসম্পাতে উহা অপরূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া

উঠিয়াছে। আমরা বারুণীর কেশরচনার দৃশ্যটির কথা বলিতেছি। বারুণীর সেই চিত্রটি,—সমুদ্র-জলতলে প্রবাল-আসনে উপবিষ্টা বারুণীর কেশরচনার চিত্রটি—গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াডের সমুদ্রদেবী থেটিস (Thetis) এবং মিল্‌টনের 'কোমাস্' (Comus) নাটিকার অন্তর্গত সেভার্ণ (Severn) নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্যাব্রিনা (Sabrina) ও অপ্সরী লিজিয়ার (Ligea) আদর্শে সৃষ্ট। এ দুই মহাকবির কল্পনা মধুসূদনকে বারুণী চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। কারণ বারুণীর যে চিত্র মেঘনাদবধ কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সহিত Milton-এর কোমাস নাটিকার অন্তর্গত স্যাব্রিনা ও লিজিয়ার চিত্রের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মিল্‌টন স্যাব্রিনার চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

> "Sabrina fair,
> Listen where thou art sitting
> Under the glassy, cool, translucent wave
> In twisted braids of lilies knitting
> The loose train of thy amber dropping hair."
>
> —Comus

লিজিয়া সম্বন্ধে মিল্‌টন বলিতেছেন—

> "And fair Ligea's golden comb,
> Wherewith she sits on diamond rocks.
> Seeking her soft alluring locks." —Comus

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে মেঘনাদের প্রমোদকানন, প্রমীলার সহিত তাঁহার তথায় অবস্থান, মেঘনাদ-ধাত্রী প্রভাষার তথায় গমন এবং লঙ্কার দুর্দ্দশা শ্রবণে তাঁহার আত্মগ্লানি ও দেশাত্মবোধের উন্মেষ—এ সবই ট্যাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড'-এর একটি দৃশ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ট্যাসোর কাব্যে মেঘনাদের মতই রাইনাল্ডো (Rinaldo) প্রমোদকাননে মায়াবিনী আর্মিডার (Armida) প্রেমে

আবদ্ধ হইয়া আত্ম-বিস্মৃত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন এবং মেঘনাদ-ধাত্রী প্রভাষার মত চার্লস্ ও য়ুবাল্ডো (Charles ও Ubaldo) রাইনাল্ডোকে যুদ্ধের জন্য আর্মিডার প্রমোদপুরী হইতে আনিতে গিয়াছিল। মেঘনাদকে যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহিত করিবার জন্য প্রভাষা লঙ্কার দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিল—

"হায় পুত্র! কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"

এবং—

"হায়, পুত্র! মায়াবী মানব
সীতাপতি তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি'; রক্ষ রক্ষঃকুল—
মণি, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি।

মেঘনাদধাত্রীর এই উৎসাহবাণী ট্যাসোর কাব্যের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত অংশের অনুরূপ।—

All Europe now and Asia be in war,
And all that Christ adore and fame have won.
In battle strong, in Syria fighting are;
But thee alone, Bertold's noble son,
This little corner keeps, exiled far
From all the world, buried in sloth and shame
A carpet champion for a wanton dame.
Up, up, our camp and Godfrey for thee send.
The fortune, praise and victory expect,
Come fatal champion, bring to happy end
This enterprise begun, and all that sect
Which oft thou shaken hast to earth full low
With thy sharp brand strike down, kill overthrow.

লঙ্কার দুর্দ্দশা এবং বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মেঘনাদের আত্মগ্লানি হইয়াছিল—যুদ্ধযাত্রার জন্য তাঁহার বীর হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার বিলাসের উপকরণ ফেলিয়া, কণ্ঠের মালিকা ছিন্ন করিয়া রাইনাল্ডোর মত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের অন্তর্গত—

ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী

এই অংশের সহিত ট্যাসোর—

His nice attire in scorn he rent and tore;
For of his bondage vile that witness bore,
That done he hasted from that charmed fort ...

মেঘনাদের যুদ্ধযাত্রায় প্রমীলার আক্ষেপের সহিত ট্যাসোর কাব্যের আর্মিডার খেদের সাদৃশ্য আছে। আবার, মেঘনাদ ও প্রমীলার বিদায়চিত্রটি হোমার-রচিত ইলিয়াডের হেক্টর ও তৎপত্নী এ্যাণ্ড্রো-মেকির বিদায়চিত্রের অনুরূপ।

সুতরাং এই চিত্রাঙ্কণে মধুসূদন একাধারে ট্যাসো এবং হোমারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে গ্রীক প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রামায়ণে রাঘব পক্ষে দেবদেবীগণের প্রত্যক্ষ সহকারিতার কথা কোথাও নাই। ইলিয়াডের আদর্শে কবি এই সর্গে রামায়ণে অনুল্লিখিত ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন—হোমারের মত তিনি দেবদেবীগণকে লঙ্কাযুদ্ধ-কালে অভিনেতা অভিনেত্রীরূপে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে রামের সহায়তা করিবার জন্য পার্ব্বতী হোমারের ইলিয়াড্ কাব্যের জুনোর মত অপরূপ বেশবিন্যাস করিয়া রতিপতিকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের তপোভঙ্গ করিয়াছেন এবং কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছেন। ইলিয়াডের চতুর্দ্দশ সর্গে আছে যে ট্রোজানদিগের প্রতি জুপিটারের অনুগ্রহ দেখিয়া ঈর্ষাপরায়ণা জুনো সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী

আফ্রোদিতির দ্বারা মনোহরবেশে সুসজ্জিতা হইয়া আইডা পর্ব্বতে গমন করেন এবং নিজের মোহিনী রূপে ও সজ্জায় জুপিটারকে মুগ্ধ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করেন। মধুসূদন এই কাহিনীর সহিত কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্যে'র মদনভস্ম বৃত্তান্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া মিশাইয়াছেন।

মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গে প্রমীলার চিত্রটি অপরূপ বর্ণে চিত্রিত। মেঘনাদবধে একটি বীরাঙ্গনার চিত্র সন্নিবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই অপরূপ চরিত্রটি কবি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য কাব্য—বিশেষতঃ ট্যাসোর জেরুজালেম-ডেলিভার্ড অনুশীলন করিয়া কবির অন্তরে এক বীরাঙ্গনা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। ট্যাসোর চিত্রিত—বীরাঙ্গনা আরমিনিয়া (Erminia), ক্লরিণ্ডা (Clorinda) ও গীল্ডিপের (Guildippe) চিত্র কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ইলিয়াড্ কাব্যের বীরাঙ্গনা এথিনী (Athenæ) ও ইনিডের ক্যামিলার (Camilla) চিত্রও বীরাঙ্গনা প্রমীলার চরিত্র-সৃষ্টি বিষয়ে কবির কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু কবি কেবলমাত্র বীরাঙ্গনার চিত্র অঙ্কন করিবার আদর্শটুকুর জন্যই পাশ্চাত্য. কবিগণের নিকট ঋণী। পাশ্চাত্য কাব্যের বীরাঙ্গনাগণের চিত্রে কেবলমাত্র বীরত্ব আছে, তেজ আছে। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার বীরাঙ্গনা প্রমীলা-চিত্রে রুদ্রতেজের সহিত কোমলতার অপরূপ এক সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কল্পনার সমাবেশে প্রমীলা এক নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। পাশ্চাত্য বীরাঙ্গনাগণের রুদ্রতার মধ্যে যে মাধুর্য্যের অভাব—মধুসূদনের প্রমীলায় বীরাঙ্গনার তেজের সহিত সেই মাধুর্য্যটুকু বর্ত্তমান থাকায় এই চরিত্রটি কবির এক অপরূপ সৃষ্টি হইয়াছে। এই চরিত্রাঙ্কনে পাশ্চাত্য আদর্শ কবিকে কল্পনার সূত্র ধরাইয়া দিলেও, এই চিত্রাঙ্কণে কবির সৃষ্টির মৌলিকতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই চরিত্র-সৃষ্টির আদর্শ বা উপকরণের জন্য কবি পাশ্চাত্য কবি-কুলগুরুদিগের নিকট ঋণী। কিন্তু ইহার বর্ণবিন্যাস কবির নিজস্ব।

প্রমীলাচরিত্র সম্বন্ধে মধুসূদনের জীবনীলেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—

মধুসূদনের প্রথম কাব্যের নায়িকা তিলোত্তমা পার্থিব পদার্থসমূহের তিল তিল সমুচ্চয়ে গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যের নায়িকাও, নানাদেশীয় কবিগণের কল্পনার তিল তিল সমবায়ে গঠিত হইয়াছেন। তাসো, হোমার, ভার্জিল, কাশীরাম দাস এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রত্যেকেই ইহার দেহ নির্ম্মাণোপযোগী উপকরণ দান করিয়াছিলেন। দেব-শিল্পীর ন্যায় মধুসূদন অমৃতময়ী প্রতিভার সঞ্চার দ্বারা ইহাকে প্রাণদান করিয়াছেন।

প্রমীলার সমরসজ্জা ও লঙ্কাপ্রবেশ বর্ণনার উপরেও প্রতীচ্য কবি-কল্পনার প্রভাব রহিয়াছে।

লঙ্কায় প্রবেশকালে রতিপতি কামদেব বীরাঙ্গনা প্রমীলার সহচর।—

অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম ধনুঃ, মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম শরে!

মহাভারতেও প্রমীলার—

সম্মুখে আছেন কাম কৃষ্ণের নন্দন।

ট্যাসোর কাব্যেও বীরাঙ্গনা ক্লরিণ্ডা ও আরমিনিয়ার সহচর রতিপতি।—

Fast by her side unseen smiled Venus' son.

এইভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কল্পনাদর্শের সম্মিলনে প্রমীলার অপরূপ চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চম সর্গে মেঘনাদ ও প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গের চিত্র মিল্‌টন বর্ণিত অ্যাডাম ও ঈভের নিদ্রাভঙ্গের অনুরূপ।

ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণের সহিত লক্ষ্মণ মেঘনাদের যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া মেঘনাদকে বধ করিতে গেলে মেঘনাদ অস্ত্রাভাবে পূজার শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির দ্বারা লক্ষ্মণকে আঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু মায়ার প্রসাদে সে সকল লক্ষ্মণকে আঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। কবি ইহার বর্ণনা দিয়াছেন—

কভু বা হানিলা
রথচূড়া, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু প্রসারণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত-সুত হ'তে
করপদ্ম সঞ্চালনে !

এই অংশটি মহাকবি হোমার রচিত ইলিয়াড্ কাব্যের একটি দৃশ্যের আদর্শে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইলিয়াড্ কাব্যে Menelaus-এর প্রতি Pandarus-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণ মিনার্ভা সরাইয়া দিয়াছিলেন—

As when a mother from her infant's cheek
Wrapt in sweet slumbers, brushes off a fly.

মেঘনাদবধ কাব্যে বহুস্থানেই এইরূপে পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহ আহৃত হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যখানি অনুশীলন করিতে করিতে পাশ্চাত্য কবিগণের অনেক সুন্দর সুন্দর বর্ণনা স্মৃতি-পথে উদিত হয়। কবি যখন বলেন 'দেবকুলপ্রিয়' (২য় ও ৬ষ্ঠ সর্গে), তখন হোমারের 'Favoured of the Gods' এবং 'Favoured of the Powers Divide' মনে পড়ে। মেঘনাদবধের 'কুন্তল প্রদেশে স্বনিছে ভীষণ সর্প', ভার্জ্জিলের 'Snake locks' এবং ট্যাসোর 'hissing snakes for ornamental hair' স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার 'পশে

কি গো শোক হেন কুসুম ,হৃদয়ে ?' (১ম সর্গ), ভার্জিলের 'Can such deep hate find place in breasts divine ?' এবং মিল্‌টনের 'In heavenly spirits could such perversion dwell ?'—এই সকল বর্ণনার অনুরূপ। তাঁহার 'অস্তে গেলা দিনমণি, আইলা গোধূলি - ললাটে একটি রত্ন'—ইহা Keats-এর Hyperion-এর অন্তর্গত 'Eve's one star-এর অনুরূপ। কবি যখন বলেন—

দ্বিরদ-রদঃ নিৰ্ম্মিত গৃহদ্বার

তখন হোমারের—

> Two portals are there for their shadowy shapes,—
> Of Ivory one and one of horn.

স্মরণ হয়।

মধুসূদনের বর্ণনানুযায়ী—

> পলাইল দূরে
> মেঘদল ; তমঃ যথা উষার হসনে !

এইরূপ উষার হাসি, এবং সেই হাসিতে অন্ধকার অপসারিত হইয়া আলোকের সৃষ্টি ইউরোপীয় কবিগণের প্রিয় কল্পনা।

কবির 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার সহিত সেক্সপীয়ারের কল্পনার সাদৃশ্য আছে।—

> আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
> কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
> মুক্তিল শিশির নীরে, কে পারে কহিতে ?

—মেঘনাদবধ কাব্য

> এই যে কত মুকুতাফল, এ ফুলের দলে
> লো সখি, মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে।

—ব্রজাঙ্গনা কাব্য

Decking with liquid pearl bladed grass.
—Shakespeare, Midsummer Night's Dream

কবি যখন বলেন যে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ—

চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।

তখন ইলিয়াড্ কাব্যের দেবদূত Hermes-এর সহিত প্রিয়ামের অদৃশ্যভাবে শত্রুশিবিরে প্রবেশের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়।—

"Unseen through all the hostile camp they went."

শেষ সর্গে যেখানে প্রমীলা ও মেঘনাদের চিতার অগ্নি দুগ্ধ-ধারায় নির্ব্বাপিত করা হইয়াছে, সেই স্থানটি হোমারের বর্ণনার অনুরূপ। হেক্টরের চিতা দুগ্ধের পরিবর্ত্তে সুরার দ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

The mournful crowds surrounded the pyre,
And quench with wine the yet remaining fire.
The Iliad, Bk XXIV

পাশ্চাত্য কবিগণের কল্পনাদর্শে রঞ্জিত বর্ণনা মেঘনাদবধ কাব্য হইতে অসংখ্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

স্থানে স্থানে কবি পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পাশ্চাত্য কবিগুরুদিগের প্রতি তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। কখনও বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী বর্ণনাকে তিনি মধুরতর করিয়াছেন,—অধিকতর শ্রুতিমধুর করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু মাহাশয়কে তিনি একখানি পত্রে লিখিতেছেন—

I believe you like the opening lines of the Second Book of the Meghnad. In that description of evening you have these lines,—

অইলা সুচারু তারা, শশীসহ হাসি
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা !

These lines will no doubt recall to your mind the lines,—

"And whisper whence they stole
Those balmy spoils"—

of Milton, and the lines—

"Like the sweet south,
That breathes upon a Bank of violets
Stealing and giving odour"—

of Shakespeare. Is not the 'চুম্বন' a more romantic way of getting the thing than 'Stealing' ?

অষ্টম সর্গে রামের প্রেতপুরী দর্শন ইলিয়াডের আদর্শে রচিত—এ কথা কবি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

Mr. Ram is to be conducted through the hell to his father Dasarath like another Aeneas.

'তিলত্তমাসম্ভব কাব্য' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনায় এইরূপে নানাভাবে নানাদিক দিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব মধুসূদনের কল্পনাভঙ্গি ও বর্ণনাভঙ্গিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

কবির ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা কাব্য এবং চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীও পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ছন্দ ইটালীর মিশ্র-ছন্দের আদর্শে সৃষ্ট। এই কাব্যখানি গ্রীক ওডের সমশ্রেণী-ভুক্ত। গ্রীক ওডের রীতিকে বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া মধুসূদন বৈষ্ণব কবিতাকে পুনঃপ্রর্ত্তিত করিয়াছিলেন নবভাবে অভিষিক্ত করিয়া। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বিষয়বস্তু রাধার ভাবাবেগ এবং রাধার প্রেমের আকুতি হইলেও, ইহার মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের ভক্তি আদর্শের পরিবর্ত্তে কেবল স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর নিষ্ঠা আর প্রাণের আকর্ষণ ও আবেগ

অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই হিসাবে এই কাব্যখানি পাশ্চাত্য আদর্শের Love lyric। এই কাব্যে কবির রোমান্টিক কল্পনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রজাঙ্গনায় রোমান্টিক কবিদিগের মত Subjective বর্ণনা বর্ত্তমান।

'বীরাঙ্গনা কাব্য'-খানি ইটালীর কবি Ovid-এর Heroic Epistles-এর আদর্শে রচিত। পাশ্চাত্য সনেটের আদর্শে তিনি তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। সনেটের ছন্দ এবং রচনা-রীতি বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য আদর্শকে বিশেষ সফলতার সহিতই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন এবং সে বিষয়ে ইটালীর পেত্রার্কই (Petrarch) ছিলেন কবির আদর্শ।

বিষয়-নির্ব্বাচনে মধুসূদনের কল্পনা ভারতের পুরাতন কথার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভাব কল্পনা-ভঙ্গি অথবা ছন্দের নব নব আদর্শের, কিংবা নব নব রচনানীতির প্রবর্ত্তন বিষয়ে এবং কাব্যের নব নব রূপ-সৃষ্টির বিষয়ে মধুসূদন পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। এই কারণে মধুসূদনের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের অভিনব সৌকর্য্য সাধন হইয়াছিল এবং বাংলা সাহিত্য বিচিত্রতার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। মধুসূদন কর্ত্তৃক বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবর্ত্তন এবং তাহার ফলে বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সমৃদ্ধিসাধন সম্বন্ধে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করি—

মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নবযুগ। ইংরেজি সাহিত্য যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের 'সঞ্জীবনৌষধি-রসে' সঞ্জীবিত হইয়াছিল—যেন একটা উত্তাল ভাবসমুদ্রের বিরাট বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গসাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরেজি সাহিত্য-দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাব-রাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল; বঙ্গভাষা নবযৌবন লাভ করিল।

মধুসূদন—হেমচন্দ্র—নবীনচন্দ্র

মধুসূদন ছিলেন স্রষ্টা কবি। তিনি আধুনিক যুগোপযোগী ভাব ভাষা ও ছন্দ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। নব নব সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যে তাঁহার প্রত্যেকখানি কাব্য ঝলমল করিতেছে। বাংলায় তিনি সাহিত্য-সৃষ্টির যে আদর্শের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যুগপ্রবর্ত্তক মহাকবি বলিয়া চিরদিন সমাদৃত হইবেন। বাংলা কাব্যসাহিত্যে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া হেম নবীনের প্রতিভা বিকাশ হইয়াছিল—তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনার আদর্শ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, গ্রীক ওডের রীতিকে বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি পত্রকাব্য রচনা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে রোমান্টিক প্রেমের আদর্শ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। Subjective বা স্বানুভাবাত্মক কবিতা রচনার তিনি অগ্রদূত। মধুসূদন নব নব ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভিন্ন, তিনি সনেটের ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইটালীর মিশ্র ছন্দকে বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। Stanza ভাগ করিয়া কবিতা রচনার পথপ্রদর্শক তিনি, তিনিই পয়ার অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে নমনীয় (flexible) করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে একটা গতির আবেগ—গতি-চ্ছন্দ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। কবি মধুসূদনের সৃষ্টির বিরাম এখানেই হয় নাই। তিনি বহু নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, বহু যৌগিক ও সমস্ত-পদ গঠন করিয়াছেন; ব্যুৎপত্তিলব্ধ শব্দ উদ্‌ভাবন করিয়া ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন, বহু অপ্রচলিত আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া ভাষার নবজীবন দান করিয়াছেন,—নামধাতুর প্রয়োগে বাংলাভাষার ক্রিয়াপদ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ধ্বন্যাত্মক

শব্দ উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাঠ-সৌকর্য্যের জন্য এবং শ্রুতিমধুর হইবে বলিয়া তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধ বহু শব্দ সৃষ্টি করিয়া ও প্রয়োগ করিয়া বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভাষাকে ওজস্বী করিবার জন্য এবং ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য্যের জন্য তিনি যে সকল সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ শব্দাবলী ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন—অজ্ঞতাবশতঃ ঐ সকল শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নাই। এ সম্বন্ধে একটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই বিষয়টি সুপরিস্ফুট হইবে। কবি তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে বরুণপত্নী 'বরুণানী'কে—'বারুণী' বলিয়া উল্লেখ করিয়া আত্মসমর্থনকল্পে লিখিলেন—

"The name is বরুণানী; but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules".

এই সকল নূতন প্রচেষ্টা মধুসূদনের ন্যায় সাহসী ও বিদ্রোহী কবির পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল ও শোভা পাইয়াছিল।

মধুসূদন ছিলেন আসাধারণ শব্দশিল্পী কবি। তিনি শব্দাড়ম্বরের দ্বারা রচনার ওজস্বিতা সঞ্চার করিয়াছেন। অনেক সময়ে তিনি সাধারণের দুর্ব্বোধ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া রচনার গাম্ভীর্য্য দান করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য এই জন্য শিক্ষিত জনগণের নিকট সমাদৃত হইলেও, সাধারণের কাছে সুপরিচিত হইতে পারে নাই। মধুসূদনের প্রধান গুণ উদ্ভাবনা ও তেজস্বিতা। পদবিন্যাসের সময়ে তিনি কথার হ্রস্বতা দীর্ঘতা ও ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহাদের উপযোগিতা বা প্রচলন বিচার করেন নাই। বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিস্ফুটনে বিভোর হইয়া তিনি কাব্য-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের সৃজনীপ্রতিভার আলোকস্পর্শে বাংলা কাব্যসাহিত্য নানাভবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। তিনি বঙ্গসাহিত্যকে বিচিত্রতার আস্বাদন দিয়া, বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তিটুকু প্রকাশ করিয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের সৃজনীপ্রতিভার আলোচনা করিলে, তাঁহার দুঃসাহসে অবাক হইয়া যাইতে হয়। সেকালের সেই দীনা বঙ্গভাষা, যাহাতে পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন অন্য কোন ছন্দে রচনা কল্পনাতীত ছিল—যে যুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যে ছিল অনুপ্রাসের ঘটা—সেই ভাষায় তিনি মিল্টন প্রভৃতি কবির কাব্যের সুর, ছন্দ, ভাব ও কল্পনাকে প্রবাহিত করাইলেন। ইহাকে অসাধ্যসাধন ভিন্ন আর কি বলিব?

মধুসূদন অতি অল্পকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে তিনি মাতৃভাষার যে উন্নতি সাধন করিয়া যান, তাহাতে তাঁহার সহিত একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনও কবি বা লেখকের তুলনা হয় না। তিনি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দ্বারা মাতৃভাষার যে উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাংলা ভাষার ইতিহাসে তাঁহার স্থান চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অনেকেরই ধারণা যে, তিনি বুঝি কেবলমাত্র মিত্রচ্ছন্দরূপ নিগড় ভগ্ন করিয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যকে গাম্ভীর্য্য ও স্বাধীনতা প্রদানপূর্ব্বক প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পদ্যসাহিত্যে তাঁহার দান অফুরন্ত। মধুসূদনের মিত্রচ্ছন্দও অসামান্য মাধুর্য্যমণ্ডিত। বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নব নব সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী।

বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদন যে আদর্শের প্রবর্ত্তন করিলেন হেম, নবীনের কাব্যে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। তবে মধুসূদনের কাব্যাদর্শ হেম নবীনে অনুসৃত হইলেও হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের

প্রতিভার বিশেষত্বটুকুও তাঁহাদের কাব্যে ও কবিতায় পরিস্ফুট। মধুসূদনের কল্পনা কবিত্বশক্তি ও উদ্ভাবনা-শক্তির সহিত হেম নবীনের কল্পনা কবিত্বশক্তি ও উদ্ভাবনাশক্তির পার্থক্য ছিল। সেই পার্থক্যের এবং তৎসহ হেম নবীনের প্রতিভার বিশেষত্ব আমরা এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

মধুসূদন শব্দশিল্পী; শব্দাড়ম্বর দ্বারা তিনি কাব্যের মধ্যে একটা গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের শব্দসম্ভার অল্প; কিন্তু তাঁহার রচনায় যে কঠোর নিরাভরণ সরলতা ও হৃদয়াবেগের উদ্বেলতা আছে, তাহার দ্বারাই তাঁহার কাব্যের মধ্যে পৌরুষ-ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হইয়াছে। সাধারণের দুর্ব্বোধ্য শব্দাবলী প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন তাঁহার ভাষাকে যে গাম্ভীর্য্য দান করিয়াছেন, সেই গাম্ভীর্য্য হেমচন্দ্র ভাবাবেগের মধ্য দিয়া দান করিয়াছেন। একজন শব্দশক্তির সাধক, অপরজন তেজোব্যঞ্জক ভাবাবেগের ভাণ্ডারী।

মধু ও হেম উভয়েই প্রাচীন মহাকাব্যের পৌরাণিকী আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়ছেন। মধুসূদন আদর্শকে হীন করিয়াছেন; হেমচন্দ্র অনুকৃত কাহিনীকে উন্নত করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের সকল রচনার মধ্যে স্পষ্টতঃ বা ইঙ্গিতে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় আছে—এজন্য তাঁহার কাব্যের সকল ত্রুটি মার্জ্জিত হইয়া সেগুলি লোকসমাদৃত হইয়াছিল।

মধুসূদন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এই কবিত্রয়ই বিদেশী সাহিত্যে হইতে আখ্যায়িকা, ভাব, উপমা ইত্যাদি আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নূতন আকর্ষণী শক্তি সঞ্চার করেন।

মধুসূদনের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যেও পাশ্চাত্য ভাব ও কল্পনাদর্শ বর্ত্তমান। বৃত্রসংহারের প্রথম সর্গের অসুর-মন্ত্রণাসভা মিল্‌টনের অসুর-মন্ত্রণাসভার অনুরূপ, তাঁহার সরস্বতী-আবাহনে মিল্‌টন ও মধুসূদনের

:প্রভাব। বৃত্রসংহারের শচীহরণ ট্যাসোর কাব্যের সফ্রোনিয়াকে অপহরণ করার ভাব লইয়া রচিত, বৃত্রসংহারের নিয়তিদেবী গ্রীক Fate এর প্রতিচ্ছায়া। নবীনচন্দ্রে জুলিয়াস সীজার, রিচার্ড দি থার্ড, প্যারাডাইস্ লষ্ট্, চাইল্ড্ হ্যারল্ড্ প্রভৃতি কাব্যের কল্পনাদর্শ বর্ত্তমান —অর্থাৎ সেক্সপীয়ার, মিল্টন ও বায়রণের প্রভাব নবীনচন্দ্রে বিদ্যমান। পলাশীর যুদ্ধের প্রথম সর্গে প্যারাডাইস লষ্টের প্রভাব অনুভূত হয়— আর কাব্যখানির আদ্যোপান্ত বায়রণের Child Harold-এর প্রেরণা কার্য্য করিয়াছে।

মধুসূদনে ভাবরসের যে একটা সরলোজ্জ্বল ওজস্বী প্রবাহ ছিল, হেমচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া তাহাই দৃঢ় ও সংযত চরিত্রসৃষ্টিতে ও হৃদয়াবেগের ভাবোচ্ছ্বাসে নিয়োজিত হইয়াছে।

মধুসূদন ইংরেজি Blank Verse-এর অনুসরণ করিয়া ছন্দে একটা অবাধ প্রবাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের ছন্দে সেই প্রবাহ বা সেইরূপ একটা অবাধ গতিবেগ নাই।

মধুসূদন কাব্যের কাঠামো স্রষ্টা—সেই কাঠামোয় কাদা মাটি রং দিয়া মূর্ত্তি রচয়িতা হেম নবীন। কাব্যের যে কাঠামো মধুকবি দিয়া গেলেন তাহারই আধারে হেম নবীনের কাব্যের চরিত্রসকল এবং স্বাদেশিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হেমচন্দ্র চরিত্রসৃষ্টিতে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, নবীনচন্দ্রে চরিত্রসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের প্রবাহ ও উৎকর্ষ আছে।

হেমচন্দ্রের কাব্যে বৈষ্ণব কবিগণের মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণ আছে। কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের প্রাঞ্জলতা, কবিকঙ্কণের চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা, ভারতচন্দ্রের পদলালিত্য, ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গরসিকতা—এ সবই বিদেশী ভাবের সহিত হেমচন্দ্রের কাব্যে মিশিয়াছে।

হেমচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন-দক্ষতা প্রশংসনীয়। বৃত্রসংহারের চরিত্রগুলি ধীরোদাত্ত। এই কাব্যে প্রেম, বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের যে আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে ইহা জনপ্রিয় হইয়াছে। ভাবসম্পদে

মধুসূদনের মেঘনাদবধ এবং হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার উভয়ই তুল্য। কিন্তু ভাষা ও ছন্দ-সম্পদে মেঘনাদবধ কাব্যই উৎকৃষ্ট।

হেমচন্দ্র মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, আবার সুন্দর সুন্দর গীতি-কবিতাও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ কাব্য ও কবিতার মূল সুর স্বদেশপ্রীতি—একথা বলা চলে। তাঁহার কাব্য ও কবিতার মধ্য দিয়া বীর ও করুণ উভয়বিধ রসই উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার ব্যঙ্গকবিতায় দেশের লোক প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছে। হেমচন্দ্র রাজনীতি-বিষয়ক কবিতা রচনা করিয়াছেন, ধর্ম্ম-বিষয়ক কবিতা রচনা করিয়াছেন। কবির 'দশমহাবিদ্যা' ধর্ম্মভাবমূলক উচ্চাঙ্গের গীতি-কবিতা। এই কাব্যের যেস্থানে কবি শিবের বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে কবি এক নূতন ছন্দ উদ্ভাবন করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন।—

রে সতি! রে সতি! কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ।

এখানে ছন্দের ক্ষেত্রে কবির সৃজনী-প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের উন্নতিবিধানের জন্য মধুসূদনের মতই হেমচন্দ্র অনুকরণ ও উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কল্পনার সমন্বয়ে রচিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ সম্পদ অনুবাদ করিয়াও হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেন। পোপ, টেনিসন, ড্রাইডেন প্রভৃতি ইংরেজ কবির কবিতার তিনি সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। সেক্সপীয়ার, শেলী, টেনিসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবির সাহিত্য হইতে আখ্যায়িকা ভাব উপমা ইত্যাদি আহরণ করিয়া তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে নূতন আকর্ষণীশক্তি সঞ্চার করেন।

আধুনিক যুগোপযোগী গীতিকবিতার পুষ্টিসাধনে হেমচন্দ্রের গীতিকবিতা যতখানি সহায়তা করিয়াছিল, মধুসূদনের গীতিকবিতা ততখানি সহায়তা করিতে পারে নাই। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' রাধার বেনামী গীতিকবিতা—কবির নিজস্ব অনুভূতি ভাব ও ভাবনা সেখানে রাধার মুখ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। একমাত্র চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীই মধুসূদনের রচিত উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার নিদর্শন। সেখানে কবির ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতি অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং উত্তরকালের বঙ্গসাহিত্যে এই শ্রেণীর কাব্যরচনা অনুকৃত ও অনুসৃত হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের কবিকল্পনা মধুসূদন হইতে ভিন্ন। সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও অনুভূতি হেমচন্দ্রের কাব্যে পরিস্ফুট। তদনীন্তন বাংলার সামাজিক জীবনের আশা ও আদর্শ তাঁহার কাব্যে রহিয়াছে।

জগতের কবিদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যুগপ্রতিনিধি কবি এবং দ্রষ্টা কবি (Representative poets and Prophet) হেমচন্দ্র প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবি। কারণ সে যুগের কামনা বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা হেমচন্দ্রে রহিয়াছে।

হেমচন্দ্রের কাব্যে সূক্ষ্ম সুরের মাধুর্য্য সর্ব্বত্র নাই—তবে eloquence আছে। মধুসূদনের মত epic grandeur তাঁহার কাব্যে নাই, আছে গদ্যের মত সহজ সরল স্বচ্ছ বর্ণনা। সর্ব্বজনবোধ্য চিন্তা ভাব ও ভাবনা কাব্যে মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধরণকে তিনি তাঁহার কাব্যের রসগ্রহণে সমর্থ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের কাব্যে আধুনিকতার উপকরণ ছিল। তাঁহার কাব্যের form অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য কাব্যানুযায়ী হইয়াছে। আধুনিক কাব্যদর্শ অনুযায়ী মধুসূদনের মতই তিনি তাঁহার কবিতায় Stanza ভাগ করিয়াছেন। কাব্যরচনায় মধুসূদন প্রাচীন সংস্কারকে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রাচীন সংস্কার একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া—প্রাচীন ভাষা ও ভঙ্গির সহিত নূতন আদর্শের

কাব্যরস মিশ্রিত করিয়া জনসাধরণের মধ্যে পরিবেশন করিলেন। পুরাণের কাহিনীকে হেমচন্দ্র আধুনিক ধরণে বিবৃত করিয়াছেন। ফলে মধুসূদনের উন্নততর সৃষ্টির মাধুর্য্য যাঁহারা ঠিক অনুধাবন ও আস্বাদন করিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহারাও হেমচন্দ্রের সৃষ্ট নূতন সাহিত্যরসের প্রতি উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আধুনিক যুগোপযোগী কাব্যরস সর্ব্বসাধারণের প্রাণের নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বাংলার জনসাধারণ কাব্যের নূতন ভঙ্গি ও রসের সহিত পরিচিত হইল।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম, নবীন —যে কয়জন কবি বাংলাসাহিত্যে আবির্ভূত হইয়া কাহিনীকাব্য বা মহাকাব্য রচনা করেন, তাঁহাদের সকলেরই কাব্যের ও কবিতার মূলকথা দেশপ্রীতি। নবীনচন্দ্রের কাব্যের মূলকথাও দেশপ্রীতি। পলাশীর যুদ্ধ ও রঙ্গমতী নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার বিখ্যাত কাব্যত্রয় রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসেও দেশপ্রীতি উৎসারিত হইয়াছে। এই কাব্যত্রয়ে কবি পৌরাণিক মহাভারতের আখ্যায়িকাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একটা বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য, একটা বিরাট ধর্ম্ম স্থাপন ও প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছেন। এই কাব্যত্রয়ে কবির পরিকল্পনা অতি সুন্দর। জাতির মনে সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্ম্মের যে উচ্চ ভাব জাগাইয়া তোলার প্রয়োজন ছিল, তাহা কবি এই কাব্যত্রয়ের সাহায্যে জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই বলিতে হয় যে, কাব্যের মধ্যে নিখুঁত দেশানুরাগ ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করাই নবীনচন্দ্রের সাহিত্যের বিশেষত্ব। কিন্তু দেশানুরাগ বা ধর্ম্মতত্ত্ব নিছক কল্পনা অথবা কবিত্বের উপর ভিত্তিলাভ করিয়া রূপ পাইতে পারে না। সেইজন্য ভাব ও ভাবনায় নবীনচন্দ্রের কাব্য সমৃদ্ধ হইলেও কাব্যহিসাবে তাঁহার রচনা পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে নাই।

মধুসূদনের মত নবীনচন্দ্রের কল্পনা কাব্যপ্রধান (Poetic) নহে। তাঁহার কাব্যরস সৌন্দর্য্যময় নহে। তবে তাঁহার কল্পিত বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। আধুনিক যুগের ভাবধারার সহিত মহাভারতের আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাব্যরচনা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ চরিত্রে যেরূপে ইতিহাসের আদর্শকে নূতন ভাবে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্রের রৈবতক কুরুক্ষেত্র আর প্রভাসে সেই ভাব বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রে ও নবীনচন্দ্রের সৃষ্ট কৃষ্ণচরিত্রে সাদৃশ্য আছে।

একটা প্রবল ভাবপ্রবণতাও নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিশেষত্ব। কবির সেই ভাবপ্রবণতা অপূর্ব্ব সুরে ও ঝঙ্কারে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার কাব্যসমূহে।

রঙ্গলালে আর হেমচন্দ্রে অনেক ক্ষেত্রেই ভাব ভাষা ও ছন্দের জড়তা আছে। কিন্তু মধুসূদনে ও নবীনচন্দ্রে ভাবের সৌষ্টব, ভাষার নমনীয়তা, ছন্দের একটা অপরূপ আবেগ, গতি ও ঝঙ্কার আছে। নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতি তাঁহার কাব্যসমূহে কবিত্বমণ্ডিত হইয়া রূপ পাইয়াছে। তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ সুরে ও ঝঙ্কারে অতি উপাদেয় কাব্য হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যসৃষ্টিতে ছিল ভাষার ও ভাবের উচ্ছ্বাস, ছিল Byron-এর মতে আবেগের উদ্বেলতা ও প্রবলতা। এই আবেগবহুলতা (emotionalism) মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাব্যের ত্রুটিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত কবিদিগের মধ্যে ছিল ভাব ও ভাবনার অতিশয্য—কোন্ একটা বিশেষ চিন্তাকে, জাতির অথবা ব্যক্তির আদর্শকে প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠার উৎকণ্ঠাই ছিল তাঁহাদের প্রবল প্রবৃত্তি। খাঁটি কাব্যরস পরিবেশন অথবা কাব্যকলার

উৎকর্ষসাধনের প্রবৃত্তি এযুগে আবির্ভূত কবিগণের মধ্যে শুধুমাত্র মধুসূদনে, নবীনচন্দ্রে আর বিহারীলালে পরিলক্ষিত হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের দেশানুরাগের কথা বাদ দিলেও—কাব্যহিসাবে উহা নবীনচন্দ্রের এক অপূর্ব্ব স্বষ্টি। কল্পনার সংযত লীলায়, ছন্দের মাধুর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে ও সংযমে—ভাষার লীলাচাঞ্চল্যে ও গতির দ্রুততায় এই কাব্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এই কাব্যে তিনি যে পরিপূর্ণ কাব্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন—কাব্যের ও আর্টের দিক দিয়া তিনি যে সুন্দর স্বষ্টি করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

মধুসূদনের মহাকাব্য কবিপ্রেরণার স্বষ্টি—মধুসূদনে তত্ত্ব নাই, চিন্তা নাই, আছে নিছক কবিকল্পনার বিকাশ। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যে—পলাশীর যুদ্ধে এবং রৈবতকে, কুরুক্ষেত্রে, প্রভাসে—কবি তত্ত্ব ও চিন্তাকে কবিত্বমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মধুসূদনের কাব্যে অথবা নবীনচন্দ্রের কাব্যে যে ধরণের কবিদৃষ্টি ও কাব্যকুশলতার পরিচয় বর্ত্তমান, হেমচন্দ্রে তাহার একান্ত অভাব। নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে ইউরোপীয় মহাকাব্যের বিশালতা বর্ত্তমান থাকিয়া সেগুলিকে অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে।

বাংলার প্রাচীন ছন্দ পয়ারের নূতন ঝঙ্কার ও ধ্বনি আবিষ্কার করেন মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন করিয়া। মধুসূদনের ছন্দের সেই ধ্বনিটিকে ধরিতে পারিয়াছিলেন নবীনচন্দ্র। তাই তিনি তাঁহার পলাশীর যুদ্ধে এবং অন্যান্য নানা কবিতায় পয়ারের আশ্চর্য্যরকম স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতিকে লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। হেমচন্দ্র মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধুর্য্য ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার বৃত্রসংহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বিষয় ও কল্পনা আধুনিক যুগোপযোগী হইলেও, কাব্যের সুরটি কেমন যেন বেসুরা বাজিয়াছে।

মধুসূদন, হেম, নবীনের প্রতিভায় সদৃশ্যও ছিল, আবার স্বতন্ত্রতাও ছিল। এই তিনজনে কবিই বাংলা কাব্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের উন্মেষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। কাব্যের আদর্শে, কল্পনায় এবং ছন্দের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্যের সন্ধান মধুসূদন দান করিয়াছিলেন, তাহাকেই লালন করিয়া হেম নবীন বঙ্গের পাঠকসমাজের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত আধুনিক যুগোপযোগী কাব্যের দিকেই ফিরাইয়া দিলেন। মধুসূদন, হেম ও নবীনের কাব্য ও কবিতা প্রকাশের পর বঙ্গসাহিত্যে যে আদর্শ প্রবর্ত্তিত হইল, তাহাতে বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় আদিরসাত্মক কাব্য অথবা শুধুমাত্র অনুপ্রাসবহুল কাব্য বা কবিতা যে আর বাংলার শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে সে সম্ভাবনা রহিল না। অতঃপর বাংলা কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। SUBODH DATTA 466

সমাপ্ত

নিদর্শনী